বাজিমাৎ

–কবির হোসেন

পরীক্ষা শেষে বেড়াতে এসেছে শ্রাবণী। আমাদের একটু দূরের আত্মীয় হলেও অবাধ আসা–যাওয়ার কারণে শ্রাবণীর পরিবারের সবাই ছিল খুবই কাছের। সন্ধ্যা বেলা শুরু হলো লুডু খেলা। শ্রাবণী সবার সঙ্গে জয়ী হচ্ছে। আমিও সবার মধ্য থেকে একজনকে উঠিয়ে দিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করি। এবার হেরে যায় শ্রাবনী। শুরু হয় জয় পরাজয়ের খেলা।

কখনো আমি, কখনো শ্রাবণী জয়ী হচ্ছে। শ্রাবণীর প্রচুর জিদ। তাই ঠকলে আবার জয়ী হওয়ার জন্য খেলতে বসে। ওদিকে রাত শেষে ভোর হতে থাকে। শ্রাবণীর সঙ্গে আমার সখ্য বাড়তে থাকে দিন দিন। একদিন শ্রাবণীকে জানাই ভালোবাসার কথা।

শ্রাবণী বললো, অসম্ভব। তোমাকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব না। তোমার সঙ্গে লুডু খেলি, হাসি–ঠাট্টা করি এতেই তুমি ভালোবেসেছো আমায়। তোমার চেয়েও স্মার্ট ছেলেদের কখনো পাত্তা দিইনি।

শ্রাবণীর না বলার পর থেকে অন্য চিন্তা করতে থাকি। কিভাবে ঘায়েল করতে পারি শ্রাবনীকে!

রাতে আমার বুদ্ধি কাজে লাগলাম। ইচ্ছা করে শ্রাবনীর সঙ্গে হারতে লাগলাম লুডু খেলায়। রাত বাড়তে লাগলো, অন্যরা সবাই চলে গেল। এবার বললাম, শ্রাবনী, আমি এ খেলায় জয়ী হবো।

সে বললো? আর কখনো জয়ী হতে পারবে না।

তাহলে বাজি হয়ে যাক।

হোক বাজি।

শ্রাবনী, যদি আমি জয়ী হই তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে আর তুমি জয়ী হলে আমি তোমার পথ থেকে সরে দাড়াবো।

শ্রাবনী রাজি।

শুরু হলো খেলা। ফজরের আজান শুরু হলো। শ্রাবনী পরাজয় স্বীকার করলো এবং বাজির কথা রাখবে বলে ঘুমাতে চলে গেল।

আনন্দে আমার আর ঘুম হলো না বাজিমাৎ করতে পেরে।

বেশ জমে উঠলো আমাদের ভালোবাসা। আজ বাজি হলো, যদি শ্রাবনীকে ঠকাতে পারি তাহলে শ্রাবনীর ঠোটে চুমু খেতে পারবো।

জয়ী হলাম এবং চুমু খেলাম।

লজ্জায় শ্রাবনী পালালো।

ধাপে ধাপে এগিয়ে চললাম জয়ী হয়ে হয়ে। এবার শ্রাবনীকে একান্তই নিজের করে পেতে চাইলাম।

শ্রাবনী এবার বাজি ধরলো না। সময় নিল, ভেবে–চিন্তে বাজি ধরবে।

আমি জানি, শ্রাবনী বাজি ধরবেই। কারণ সহজেই হার মানার মেয়ে শ্রাবনী না।

ঠিক তিন দিন পর শ্রাবনী এলো, বাজিতে রাজি।

খেলা শুরু হলো। শ্রাবনী বার বার ঘেমে যাচ্ছে। একটি গুটি ঘরে ওঠাতে পারলেই আমি হবো রাজা।

শেষ পর্যন্ত শ্রাবনীর শেষ পরাজয় ঘটলো। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম শ্রাবনীর অসম্ভবকে সম্ভব করতে।

কিন্তু সেদিন রাতেই ধরা খেয়ে গেলাম বাবার কাছে।

পুরো ঘর জুড়ে শুধু আমাদের নিয়েই আলোচনা। সবাই আমাকে বাচাতে ব্যস্ত। সব দোষ দিচ্ছে শ্রাবনীকে।

শ্রাবনী প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। বাড়িতে জানাজানি হলে আত্মহত্যা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

একটি ঘরে বন্দী আমি ও শ্রাবনী। খাওয়া, দাওয়া বন্ধ।

হঠাৎ দরজা খুললো। চেয়ে দেখি শ্রাবনীর ও আমার বাবা। পাশে আছে কাজি সাহেব। বিয়ে পড়িয়ে কাজি চলে গেলেন।

শ্রাবনীর বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বুকে টেনে নিয়ে বললেন, আমার মেয়েটা জিদ্দি মেয়ে, তুমি একে একটু সামলে নিও।

শুরু হলো আমাদের নতুন সংসার।

সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে এখনো আমরা লুডুর বোর্ড নিয়ে খেলতে বসি। বাজি ধরি কি হবে শ্রাবনীর? ছেলে, না মেয়ে?

এভাবেই নিত্যনতুন বাজিতে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা আগামীর পথে, ভালোবাসার পৃথিবীতে।

ভোলা থেকে

ইওরো কয়েন

–পলাশ রহমান

আজ থেকে চার বছর আগের এক সন্ধ্যা। আমি আর বন্ধু আমিন বসে আছি সান মার্কোর সাগর পাড়ে।

আমিন বললো, বহুদিন চাদ দেখিনি।

আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললাম চেষ্টা করুন।

আমিন কিছু একটা উত্তর করতে যাচ্ছিল তার আগেই আমাদের সামনে এসে দাড়াল এক সুন্দরী ষোড়শী। সাগরের ঠাণ্ডা বাতাসে তার সোনালি চুল উড়ছে ফুর ফুর। খুব বিনয়ের সঙ্গে বললো, *পই দারে উন মোনেত্ত পেরফাভোরে?* বললাম, পেরকে?

ছোট্ট উত্তর, পের আয়ুতারে।

আমার বন্ধু আমিনের আবার খুব দয়ার শরীর।

মানিব্যাগ খুলে মেয়েটার হাতে এক ইওরো তুলে দিল।

মেয়েটা বিনিময়ে ধন্যবাদ জানালো, গ্রাচে।

বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তার চলে যাওয়ার দিকে। এমন সুন্দরী যুবতী মেয়েকে এর আগে কখনো এভাবে পয়সা চাইতে দেখিনি। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম মেয়েটি আস্তে আস্তে হেটে একটা ফাকা জায়গায় গিয়ে দাড়ালো। দুচোখ বন্ধ করলো। এরপর হাতের মুঠো থেকে কয়েনটা ছুড়ে দিল সাগরের নীল পানিতে।

অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকলো স্থির।

আবার হাটতে শুরু করলো। অনেকটা আমাদের কাছাকাছি এসে বসলো। অপলক তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। তাকে খুব বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে এগিয়ে গেলাম। অনুমতি নিয়ে পাশে বসলাম।

কি নাম তোমার?

কৃসতিনা।

তোমার মন খারাপ? মাথা নেড়ে বললো, হ্যা।

আমি কি জানতে পারি কেন?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কৃসতিনা ডুকরে কেদে উঠলো। আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কি করবো বা কি করা উচিত বুঝতে পারছি না। কোনোরকম সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। তাতে কাজ হলো। সে একটু শক্ত হয়ে বলতে শুরু করলো।

আজই তার বন্ধু তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে বলেছে, কৃসতিনার সঙ্গে তার ভালোবাসা আর দীর্ঘ করতে চায় না। অথচ কৃসতিনা তাকে ভুলতে পারছে না। কৃসতিনার গোটা অস্তিত্ব জুড়ে আছে বন্ধু টমাস। আর

তাই কৃসতিনা আমাদের কাছ থেকে এক ইওরোর একটি কয়েন নিয়েছে সাহায্যের কথা বলে। সেটা ছুড়ে মেরেছে সাগরে, যেন টমাস ফিরে আসে।

কৃসতিনা বিশ্বাস করে চোখ বন্ধ করে পানিতে পয়সা ফেললে মনের আশা পূর্ণ হয়। তাই সে নিজের কাছে পয়সা না থাকায় আমাদের কাছে থেকে নিয়েছে।

আমরা মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম কৃসতিনার মনের আশা পূর্ণ হোক।

কিন্তু হয়নি। কৃসতিনার বন্ধু টমাস ফিরে আসেনি।

কৃসতিনার জীবনও থেমে থাকেনি। সে এখন নতুন বন্ধুর হাতে হাত রেখে সান মার্কোর সাগর দেখে।

ইটালি থেকে

palashrahman@libero.it

কুরূপা

আমরা দুই বোন। আমি কালো, অসুন্দর আর আমার ছোট বোন ফর্শা, সুন্দরী। আমাদের পরিবারের সবাই সুন্দর শুধু আমি বাদে।

ছোটবেলা থেকেই এ কথাটা নানান ভাবে, নানা স্থানে, নানান জনের মুখে শুনে আসছি, আমি অসুন্দর, অসুন্দর, অসুন্দর...। মনে আছে, ছোটবেলায় কতো কেদেছি এ দুঃখে। লুকিয়ে লুকিয়ে নামাজে আল্লাহর কাছে কাদতাম। বলতাম, আল্লাহ আমাকে সুন্দর করে দাও। কচি মনে একটা আশা ছিল, হয়তো বা আল্লাহ পরের দিনই আমাকে সুন্দর বানিয়ে দেবে। সত্যি, কি বোকাই না ছিলাম, তাই না!

চেহারায় কোনো সৌন্দর্য নেই বলেই বোধ হয় আল্লাহ অন্যদিকে দরাজহস্ত হলো। পড়াশোনায় সব সময় থেকেছি ক্লাসের সবার সেরা যদিও পড়তাম খুব কমই। উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আকা- সব কিছুতেই ছিল আমার তুখোড় উপস্থিতি। যে কোনো অনুষ্ঠান জমাতে জুড়ি ছিল না আমার। ছটফটে, হাসিখুশি বলেই পরিচিতি আর আদর ছিল সবার কাছে। স্টুডেন্ট লাইফ নিয়ে বিজি থাকায় চেহারা নিয়ে একদম মাথা ঘামাতাম না। কে কি বললো তাতে আমার বয়েই যেতো!

সব মিলিয়ে ভালোই কাটছিল দিনগুলো।

এমন সময়ই হঠাৎ একদিন প্রেমে পড়লাম। ঠিক প্রেম না, বলা যায় এক ধরনের ইনফ্যাচুয়েশন! প্রথম কৈশোরের ভালো লাগা আর কি!

কিন্তু যাকে ভালো লাগলো তাকে মনের কথা জানানোর আগেই জানলাম, আমাকে সে একদম পছন্দ করে না। কারণ আমি অসুন্দর!

খুব কষ্ট পেলাম। খু-উ-ব। প্রথম যাকে ভালো লাগলো সেই কি না...!

তারপরেও সামলে নিলাম নিজেকে। মন থেকে সব রোমান্টিকতা একেবারে ঝেটিয়ে বিদায় করলাম।

ডুবে গেলাম আবার পড়াশোনায়। এসএসসি-তে আশাতীত ভালো রেজাল্ট করলাম। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল বহুগুণে। অসুন্দর হতে পারি। কিন্তু মেধা তো আছে আমার!

সেরা কলেজে ভর্তি হলাম। টিচারদের প্রিয় হতেও সময় লাগলো না।

এ সময় শুরু হলো পরিবারে অশান্তি। আধুনিক যুগের ইগোইস্ট (egoist) বাবা-মা নিজ ইগো (ego বা অহং) রক্ষার্থে সেপারেশনে চলে গেলেন।

দুই বোন অকূল পাথারে পড়লাম। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে দুবার এইচএসসি ড্রপ দিলাম। ছোটবেলার বন্ধুরা সব সিনিয়র হয়ে গেল। সে যে কি যন্ত্রণা... বলে বোঝানো যাবে না!

এক সময় অশান্তির ঝড় শান্ত হয়ে এলো। বাবা-মা শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স নিলেন না আবার আমরা সবাই এক বাড়িতে এক পরিবার হলাম।

মন শান্ত করে আমিও এবার এইচএসসি দিলাম। দারুণ রেজাল্ট হলো। বুয়েট ও মেডিকালে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। খুব একটা সিরিয়াস ছিলাম না এ ব্যাপারে। চাচ্ছিলাম ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে ক্যারিয়ার গড়তে। বাড়িতে সবার সঙ্গে এ নিয়ে বেশ মতবিরোধও চলছিল।

এতোসবের মাঝেই হঠাৎ আবার প্রেমে পড়লাম। আবার! কি থেকে যে কি হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওসব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে আর জড়াবো না, অথচ তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সব কিছু কেমন জানি বদলে গেল।

বিধাতা আসলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন? শুধুই কি কষ্ট দেয়ার জন্য?

তার সঙ্গে আমার পরিচয় সেলফোনে। Djuice-এর কল্যাণে। প্রথমে দুই এক ঘণ্টা...তারপর সারা রাত কাটতো কথা বলে। শুধুই কথা বলে... তার কথা মুগ্ধ করতো আমাকে। তার চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন, নীতি, বিশ্বাস সব কিছুতেই পেতাম আমার প্রতিফলন। দুর্বল হয়ে পড়লাম তার প্রতি।

ব্যাপারটা টের পেতেই ভয় পেয়ে গেলাম। নিজেকে সংবরণ করতে চাইলাম। কারণ প্রেম-ভালোবাসা আমার জন্য নয়। আমি জানি আমার কণ্ঠস্বর, কথা বলা সব কিছুই যে কাউকে আকর্ষণ করার। কিন্তু আমার চেহারা?

সেটা তো কারোরই ভালো লাগবে না।... অসুন্দর একটা মেয়েকে কেউ ভালোবাসতে চাইবে না।

এটাই বাস্তব।

অথচ সেই বাস্তবকেই অস্বীকার করতে চাইলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে তার থেকে দূরে রাখতে পারলাম না। সারা দিন অপেক্ষা করতাম তার মেসেজের জন্য। সেও অপেক্ষা করতো কখন রাত বারোটা বাজবে। বারোটা বাজলেই শুরু হতো কথা বলা।

যতোই নিজেকে লুকাতে চাক না কেন, আমার প্রতি তার দুর্বলতা ঠিকই টের পেতাম।

একদিন হঠাৎ করেই সে বলে ফেললো, তোমাকে ভালোবাসি।

হাজার চেষ্টা করেও তাকে মিথ্যা বলতে পারলাম না। কি করেই বা বলবো? ভালোবাসার মানুষকে কখনো মিথ্যা বলা যায়?

আমিও তাকে বললাম।

হ্যা, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

এক রাতেই যেন আমাদের জীবনটা বদলে গেল। দুজন এক সঙ্গে হাসলাম, কাদলাম পাগলের মতো। একজন আরেকজনকে বললাম, ভালোবাসি, ভালোবাসি... ভালোবাসি...!

প্রতিদিন প্রতিরাত এভাবে দুজন দুজনকে না দেখে ভালোবেসে চললাম। কুৎসিত কালো এই মেয়েটাকে যে, বলতো আমি তোমাকে ভালোবাসি, শুধুই তোমাকে। তুমি সুন্দর অসুন্দর যাই হও, আমার ভালোবাসার তাতে কিছু যায় আসে না? আমার জীবনটা সে সুখ আর আনন্দে ভরিয়ে দিল। সুখের লাল নীল তারাগুলো ঝিলমিলিয়ে উঠলো। রঙধনুর রঙে আকা শত-সহস্র স্বপ্ন ঘিরে থাকতো আমাদের।

একটা করে স্বপ্ন তৈরি করতাম আমরা। প্রতীক্ষা করতাম কবে সেই স্বপ্নগুলো সত্যি হবে!

আমাকে সে সব সময় বলতো, তোমাকে আমি তোমার চেয়েও বেশি ভালোবাসি।... সারা জীবন তাই বাসবো। আবার কখনো বলতো, আমি যদি বিয়ের পর কখনো তাকে ফেলে একা বাপের বাড়ি থাকি তাহলে সে মরেই যাবে।

এ রকম কতো অজস্র কথা, কতো অসংখ্য স্বপ্ন সে আমায় দেখাতো। আমি তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতাম হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতাম তাকে।

তবুও একেক সময় ভয় পেতাম। যদি দেখা হওয়ার পর আমাকে তার আর ভালো না লাগে?

ওই ভয়েই দেখা করতে রাজি হচ্ছিলাম না। আমার ভয়ের কথা শুনে সে হাসতো, কখনো বা রাগ করতো। বলতো, আমার ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই তোমার?

এভাবে প্রতিনিয়ত তার জোরাজুরিতে রাজি হলাম এক সময়।

দেখা হলো অবশেষে একদিন। কথা হলো। আমার দুহাত ধরে সে বললো, ভয় ভেঙেছে তোমার, বৌ? তার চোখে চোখ রাখলাম, দেখলাম গভীর ভালোবাসায় ভরা দু চোখে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। তার বুকে মাথা রেখে বললাম, কোনোদিন ছেড়ে যেও না আমাকে, কোনোদিনও না।

সে ফিশফিশ করে বললো, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

বুকভরা আনন্দ আর উপচে পড়া সুখ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

তারপরই কি থেকে কি হয়ে। সব কিছু শেষ হয়ে গেল।

সে ফিরে এলো না আমার কাছে।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম যখন ফোনে শুনলাম সে বলছে, আমাকে ভুলে যাও। আমি তোমাকে ভালোবাসি না। খুব সহজে সে বলে ফেললো কথাটা। একবারও ভাবলো না আমার কি হবে। আমি যা ভেবেছিলাম, যে ভয় পাচ্ছিলাম সেটাই সত্যি হয়ে গেল অবশেষে। অসুন্দর একটা মেয়েকে সে শেষ পর্যন্ত পারলো না গ্রহণ করতে। আমার এতো ভালোবাসা, এতো বিশ্বাস, এতো আশা সব এক নিমিষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। হেরে গেলাম আমার অসৌন্দর্যের কাছে।

প্রচণ্ড ভালোবাসায় সৃষ্টি হয়েছিল যাদের, আমাদের, না না শুধু আমার একার, সেই রঙিন স্বপ্নগুলো ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে থাকলো। এতো কষ্ট, এতো দুঃখ কি করে মানুষকে মানুষ দেয়?

আমার পুরো জীবনটা তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কি নিষ্ঠুরভাবে দলামোচড়া করে ফেলে দিল তা! রূপহীন একটা মেয়ের ভালোবাসার দাম কি এ পৃথিবীতে? প্রচণ্ড ব্যথায় নীল হয়ে যাই। আমার বুকটা ভেঙে চুরমার হয় সে তা দেখে না। আমার এক ফোটা চোখের পানি যার হৃদয়ে রক্ত ঝরাতো।

আজ আমার কান্নায় কিছু যায়-আসে না তার। পাগলের মতো কেদেছি। বলেছি, আমাকে ছেড়ে যেও না, যেও না, যেও না। শোনেনি সে আমার কথা। আমার জীবনের সবটুকু হাসি, আনন্দ, আলো কেড়ে নিয়ে আমাকে সে ঠেলে দিল গভীর এক অন্ধকারে? কেন এমন হলো আমার জীবনটা? কি দোষ ছিল আমার? কেন এতো ভালোবাসলাম তাকে? আল্লাহ এ মনে এতো ভালোবাসা দিল, একটু রূপ কেন দিলেন না?

আজ আমার কোনো স্বপ্ন নেই। নামকরা ডিজাইনার হওয়ার কোনো স্বপ্ন দেখি না। আমার মনটা যে ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। রাতের পর রাত ঘুমাই না। নিজেকে এতো তুচ্ছ, এতো ক্ষুদ্র মনে হয়। শুধু রূপ নেই বলে এতো দুঃখ পেতে হলো? নিজের সৃষ্টির ওপর তো আমার কোনো হাত ছিল না। রূপ ছাড়া মনের কি কোনো দামই নেই?

ক্ষতবিক্ষত এ মন নিয়ে পালিয়ে এসেছি অনেক দূরের ছোট্ট এক গায়ে। কাউকে যে এ মুখ আর দেখাতে ইচ্ছা করে না। ভালোবেসে আমার মতো এতো লজ্জা, এতো অপমান কি কেউ কোনোদিন পেয়েছে শুধু অসুন্দর এই অপরাধে? চোখের লোনা জল ছাড়া আর কে সঙ্গী আমার? সেই মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করে। মনে হয় সবকিছু যদি আসলে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন হতো! ভালোবাসা কি এমনই হয়? কিছুতেই তাকে ভোলা যায় না। তাহলে সে কি করে পারে আমাকে এতো সহজে ভুলে থাকতে পারে?

এক বুক যন্ত্রণা আর অসহ্য গ্লানি নিয়ে এখন বেচে আছি, বেচে থাকতে হয়, তাই। কুরূপা একটা মেয়ের জীবনের কাছে শুধু কষ্ট ছাড়া কি-ইবা পাওনা? অসুন্দর হয়েও ভালোবাসা পাওয়ার মতো লোভ করেছি, সেই অন্যায়ের শাস্তি তো আমাকে পেতেই হবে। সেই শাস্তি ভোগ করছি, যতোদিন বেচে থাকবো করতে হবেই। ভালোবাসার দাম যে বড় বেশি!

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

একত্রিশ বছর আগে

গিনি

কবে থেকে যায়যায়দিন পড়ি আজ এই পঞ্চাশউর্ধ বয়সে এসে মনে করতে পারছি না। ভালোবাসা সংখ্যার জন্য আজ থেকে একত্রিশ বছর আগের লেখা একটি প্রেমের চিঠি পাঠালাম। হুবহু যা ছিল তা পাঠিয়ে দিলাম। ১৯৬৭-তে এক কিশোরের এক কিশোরীকে ভালো লেগে যায়। অদেখা, অধরা থেকে যায় উভয়েই। দেখা হয় ১৯৭৩-এ। বিয়ে হয় ১৯৭৫-এ। সেই কিশোর তখন ডাক্তার আর মেয়েটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্সসহ (বাংলা) মাস্টার্স করেছে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তারা একে অপরকে জড়িয়ে সংসার করে চলেছে। দুই পুত্র সন্তান তাদের। দুজনই ডাক্তার, বড় পুত্রবধূও ডাক্তার। আপনার প্রচলিত ভালোবাসা দিবস-এ এ ছোট্ট শহরে এখনো অনেকে এ দম্পতিকেই খুজে ফেরে।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
মধুমতির পাড় থেকে

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

সে মাস চৈত্র মাস ছিল কি না জানি না। তোমার চোখের দিকে সেদিন পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম কি না তাও জানি না। কিন্তু তোমার চোখে হয়তো আমার সর্বনাশ ঠিকই ছিল লেখা। তোমাকে দেখার অনেক আগে থেকেই তুমি আমার মানসপ্রিয় ছিলে। মনের মণিকোঠায় অনেকভাবে সাজিয়ে তোমাকে অনেক কিছু কল্পনা করেছিলাম তখন। সেগুলো হয়তো ছিল কিশোরী হৃদয়ের রঙিন জাল বোনা। কঠিন বাস্তবে কোনোদিন তোমার মুখোমুখি হবো এ তো কখনোই ভাবিনি।

যৌবনের নৈবেদ্য যখন আমার দেহের প্রতিটি ভাজে ভাজে তখন তুমি এলে। শীতের ঝরা পাতা যখন প্রায় নিঃশেষ তখন আমার হৃদয়ে সবুজের পরশ দিতে তুমি এলে। তোমাকে দেখলাম, চিনলাম, জয় করলাম। আমি তোমাকে যতোখানি সহজে ভালোবেসে হৃদয়ের অনেক গভীরে স্থান দিয়েছিলাম তুমি তা দাওনি। তোমার হিসেবি মন অনেক হিসেব কষে ভালোবেসেছিল। এরপর শুরু হলো নতুন পরিচয়ে নতুনভাবে পথ চলা। এর আগের যে কয়টি বছর তোমার আমার জীবনে একত্রিত ছিল, তা ছিল শুধু বন্ধু। এরপর হলো প্রেমাস্পদ। চিরাচরিত যে প্রেমের সূচনা তা তো আমাদের ছিল না। এর সূচনা দৈবক্রমে, এর উৎপত্তি ভাগ্যলিপিতে, এর প্রকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গিতে, এর আস্বাদ একেবারে নতুন, এর বৃদ্ধি মানসজ, এর গভীরতা অপরিমেয় - এটা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তবুও আমরা ভালোবাসতাম একে অপরকে গভীরভাবে। আপন অন্তর মাঝে নিঃশেষিত করে। এখনো এর পরিমাপ কমেনি, আমরা আরো ভালোবাসতে শিখেছি -

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহবিধুর নয়ন সলিলে মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য নতুন সাজে।
-গিনি

পূর্ণ নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অপ্রত্যাশিত বৌ

–আনা

জীবনে কোনো দিন বিয়ে করব না। এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। একুশ বছর তো সেই স্টুডেন্ট লাইফেই শেষ। এখন আছি কর্মজীবনে। All men are not fools, some are bachelor.

সে রকমই আমি সিদ্ধান্তে অটল। আমার বয়সী বন্ধুরা কিংবা কাজিনদের প্রত্যেকেই সন্তানের বাবা। কারো সন্তান আবার স্কুলে যায়। ছুটিতে বাড়িতে গেলেই মা থেকে শুরু করে ভাবী, দাদি, প্রতিবেশী চাচাতো বোনেরা, এমন কি বাবাও ব্যস্ত শুধু আমাকে বিয়েতে রাজি করাতে। মাঝে মধ্যে রাগ করে বলি, আমার বিয়ে নিয়ে তোমাদের কেন এতো মাথাব্যথা?

সত্যিই তাদের কথাবার্তায় মনে হয় যেন আমার বিয়ে না হওয়াতে তাদের ঘুম নেই।

আচ্ছা, মানুষের জন্য বিয়েটা কেন প্রয়োজন? অতঃপর, কখন প্রয়োজন? জৈবিক কামনা মেটানো? সে তো কতোভাবেই সম্ভব। সঙ্গিনী? সে তো আমার কতোই আছে। আমার গার্লফ্রেন্ডদের সঙ্গে একদিন করে সময় দিলে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। এখানে ধর্মীয় বিষয়টাকে টানছি না। কারণ এটা ব্যক্তিগত। সামাজিকতা? আমার জানা মতে, বিবাহিতদের মাঝে বৌকে নিয়ে প্রকৃত সুখী জীবন যাপন করছে এমন দম্পতি আমাদের সমাজে বিরল।

ভালোই কেটে যাচ্ছে জীবন। অফিস, বন্ধু–বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা, ফোন, মুভি দেখা ইত্যাদি। আর এক মাস পরই পয়ত্রিশে পা রাখবো। ভাবী সেদিন ফোন করে বললো, জন্মদিনে বাড়িতে যেতে। মা'ও বললো। ছোট বোনটা খুব অনুরোধ করে বললো। আজ আমার জন্মদিন। মা, ভাবী ও ছোট বোনের রিকোয়েস্ট ফেলতে পারলাম না। বাড়িতে এলাম। বাড়িতে বড় আয়োজন দেখে আই অ্যাম সারপ্রাইজড।

একমাত্র ফুপু, যে আমার মতো স্বভাবের ছিল ছোট সময়ে। আজ সে বৃদ্ধা। তবুও সে কুমারী। ফুপু তার রুমে আমাকে ডাকলো। ছোট বোন, মা, ভাবীসহ আরো কয়েকজন ফুপুর রুমে। তার সাধ্য অনুসারে আমাকে বোঝালো। অতঃপর ফুপু আমাকে ম্যাডাম ভাবীর বাড়িতে যেতে বলল। আমার এক কাজিনের বৌ, যিনি একজন শিক্ষিকা, তাকে ম্যাডাম ভাবী বলে ডাকি।

ম্যাডাম ভাবীর ঘরে তিনি যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে বললেন, এতো দেরি কেন? বসো। আমি কিছুই বললাম না। একটু পরে ভাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো ভাবী? ভাই কোথায়?

ভাবীর উত্তর, হ্যা ভালো আছি, তোমার ভাই তাহসানকে নিয়ে পাশের রুমে শুয়ে আছে। তাহসান তাদের একমাত্র সন্তান। আমার সম্পর্কে বিভিন্ন খোজ–খবর ভাবী নিলেন। এরপর ভাবী বিয়ের প্রসঙ্গ উঠিয়ে, তার স্বভাব মতোই লেকচার শুরু করলেন। যেন তার কলেজে ক্লাস নিচ্ছেন। আমি বাধ্য ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে লেকচার শুনছি। আমাকে বোঝানোর জন্য ভাবীর কথাগুলো ছিল এরকম :

বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে বলা হয়েছে এবং মহা পিতা ঈশ্বর বলেছেন, *মানুষ একা থাকবে তা উত্তম নয়, তার মনের মতো একজন সঙ্গী আমি সৃষ্টি করবো। এবং তাই তার জন্য একজন স্ত্রীলোক তৈরি করলাম*। এতে বলা হয়নি যে একজন সুন্দরী বা বুদ্ধিমতী নারী তৈরি করেছেন তিনি। অথবা এমন কোনো নারী তৈরি করেননি যিনি বিশেষণে বিশেষায়িত। তিনি কেবল একজন স্ত্রীলোক তৈরি করেছেন এবং কেবল স্ত্রীলোক। আর তাই প্রশ্ন আসে একজন স্ত্রীলোক কেন পুরুষের জন্য এতো মূল্যবান? এর তিনটি কারণ রয়েছে :

প্রথমত. তিনি বিছানায় একজন উষ্ণ শরীরের অধিকারী। আমি কিন্তু এখানে যৌন ব্যাপার–স্যাপারে কিছু বলছি না। ওই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমি অন্য বিষয়ে বলছি। বিষয়টি আরো আদিম মানবীয় সম্পর্কের ব্যাপারে।

ধরা যাক, একটি শিশু তার দোলনা খাটে কাদছে। সে কি কোনো আলাপ–আলোচনার জন্য? অথবা স্বর্ণের আংটির জন্য? নিশ্চয়ই তা নয়। আসলে সে কাদছে কেউ তাকে কোলে নিক অথবা তাকে আদর–সোহাগ করুক, সেজন্য। অর্থাৎ সে কারো সংস্পর্শে আসতে চায়। এ সংস্পর্শ সম্পূর্ণ শারীরিক সংস্পর্শ। প্রাপ্তবয়স্করাও এর বাইরে নয়। তাদেরও প্রয়োজন শারীরিক সংস্পর্শ। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তারা এটি চায় ভিন্ন ধরনের আবহে। বলা যায়, শীতল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একটু উষ্ণতা পাওয়ার আশায়। কিংবা সামান্য আরাম পাওয়ার জন্য। একজন সাধারণ পুরুষ নারী পরস্পর এমন করেন বা জড়িয়ে ধরেন একে অপরের জন্যই। তাদের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা বাঙময় হয়ে ওঠে এভাবেই।

দ্বিতীয়ত. প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের বেলায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পারস্পরিক কথোপকথন। কোনো দম্পতি হয়তো ত্রিশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে পরস্পর কথা বলছে। তুমি কি ভাবতে পার কি এমন কথা! অথবা হেন কোনো কথা নেই যা তারা বলতে বাকি রেখেছে। কিন্তু তারপরও তারা কথা বলে যায়। এমনকি পথে চলতে চলতে তারা কথা বলে যায়। এমন কথা যা তারা অন্য কারো সঙ্গে বলতে পারে না। পুরুষটি তার সঙ্গিনীর কাছে অকপটে তার ভালো মানুষির কথা বলতে পারে। এখানে তার কোনো ধরনের ভীতি থাকে না। সে বুঝতে পারে এমন একজনের কাছে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করেছে যে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে কথাগুলো শুনছে। একই সঙ্গে পারছে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে।

তৃতীয়ত. নারী নরকে তার প্রয়োজন মেটায়। নরও নারীর প্রয়োজন মেটায়। এটা সম্পূর্ণ পারস্পরিক। যদি তোমাকে কারো প্রয়োজনই না পড়ে তাহলে তোমার মূল্য কোথায়? এ ক্ষেত্রে হয়তো তোমার চাকরিদাতা, ছাত্র, পাঠক বলতে পারে তোমাকে তাদের প্রয়োজন। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক পারস্পরিক সমতা বিধান করে না। হয় তুমি কারো কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, নয়তো তোমার কাছে কেউ। অর্থাৎ সমীহ করার বিষয়টি থাকে। কিন্তু তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি তা নয়। এখানে সমীহ করার কিছু নেই। এটাই তোমাকে আত্মমর্যাদায় অভিষিক্ত করে। প্রতিদিনের বৈরী পৃথিবীকে মোকাবেলা করার উৎসাহ ও সাহস জোগায়। একজন নরের জন্য একজন নারীর উপস্থিতি এখানেই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাডাম ভাবীর কথা শেষ হলে তাকে ধন্যবাদ দিলাম চমৎকার কথা শোনানোর জন্য। ভাবীকে বললাম, আর কয়েকটা দিন ভেবে সিদ্ধান্ত নেবো।

ভাবী মুচকি হেসে মাথা কাত করে বললেন, ওকে।

ম্যাডাম ভাবী আমার চেয়ে বয়সে বড় হবেন না। তবুও তিনি আমার বড়ভাইয়ের বউ। তাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি।

আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হই আমার আত্মীয়স্বজন, সর্বোপরি আমার বিবেকের কাছে।

ফ্যামিলিতে জানিয়ে দিলাম, আমার কোনো পছন্দ নেই। তোমাদের ইচ্ছামতো মেয়ে দেখ। বিয়ের আগে আমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলবো না। এমনকি মেয়ের ছবিও দেখবো না। মাকে বললাম শোন, তোমার পছন্দই হবে আমার পছন্দ।

অল্প কয়দিনের মাঝেই বিয়ের দিনক্ষণ পাকা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন আমার জন্য আগে থেকেই সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছে। শুধু আমার সম্মতির অপেক্ষায় ছিল।

কতো আয়োজন, কতো লোকজন। ধুমধাম করেই হয়ে গেল বিয়ে। দিন শেষে রাত হলো। আমি এক রুমে বসে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি। বন্ধুটি বললো, কিরে দোস্ত, কি হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত! জয়া তোর বউ হবে আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি।

আরে বোকা, আমি জানতাম নাকি? বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকে বধূর সাজে দেখে আমি তো থ। বিশ্বাস কর বন্ধু, আমি কিছুই জানতাম না। বিয়ের আগে আমি মেয়ের ছবি পর্যন্ত দেখিনি। আমি বললাম।

রাত এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট। ডাক পড়লো, আমার স্বপ্নের বাসরে ঢুকতে হবে।

কাচা ফুল দিয়ে বাসরঘর এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, ভেতরে কিছু আছে কিনা বোঝা যায় না। দুই হাতে ফুলের দেয়াল সরিয়ে আমার বৌয়ের দিকে তাকালাম। ওমা! একি কাণ্ড, বাসরঘরে বৌ কি এ ভাবে

থাকে নাকি। কই ঘোমটা টেনে রাঙা বৌয়ের মতো চুপচাপ বসে থাকবে আর তুমি আচল কোমরে গুজে এভাবে বসেছ যেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।

আমার বৌ বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আর ন্যাকামি করিস না। তুই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলি না কেন আগে? কতো চেষ্টা করেও তোর একটা ফোন নাম্বার জোগাড় করতে পারিনি।

আমি বললাম, কি করে পারবি, আমি তো কোনো সেলফোন ইউজ করি না।

হয়েছে হয়েছে। এসব বাদ দে।

এখন তুই আমার বৌ। বৌয়ের মতো কথা বল।

সে মুচকি হেসে লজ্জা পেল।

আমি বললাম, স্বামীকে কেউ তুই বলে না। আমিও আমার বৌকে আর তুই বলব না। বলবো তুমি।

সে বললো, সরি।

আচ্ছা আমার না হয় এতোদিন দেরি হয়েছে বিয়ে করতে। তুমি তো মেয়েমানুষ, তুমি এতো বুড়ি হলে কেন?

ক্ষেপে গিয়ে সে বললো, কি! আমি বুড়ি হয়ে গেছি?

আরে না তুমি বুড়ি হলে কি হয়েছে, আমিও তো বুড়ো।

দুই জনেই হাসলাম।

জয়া আমার ক্লাসমেট এবং ফ্রেন্ড। ক্যাম্পাসে জয়ার সঙ্গে প্রতিদিনই আড্ডা হতো। একদিন দুষ্টামি করে জয়াকে বলেছিলাম *তোকে একটা কিস করবো*।

জয়া এতো মাইন্ড করেছিল যে, আমার সঙ্গে অনেক দিন কথা বলেনি। আমার চাকরির পর তার সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ হয়নি। অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে জেনেছিলাম জয়া একটা কলেজে শিক্ষকতা করে।

আমাদের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত নাটক-সিনেমার মতো হয়ে গেল। আমি বললাম।

উত্তরে জয়া বললো, নাটক-সিনেমা তো বাস্তবতারই প্রতিফলন।

জয়া, যা হওয়ার তা তো হয়েছেই। এবার কাছে এসো, আদর দেবো।

তাকে বাহুবন্ধনে টানলাম। লজ্জায় রাঙা হলো আমার বউ। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম তাকে।

বললাম, ক্যাম্পাসের কথা মনে আছে? সেদিন এতো মাইন্ড করেছিলে কেন?

সে বললো, সেদিন তোমার বৌ ছিলাম না।

চলো, ড্রেস চেইঞ্জ করে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে আসি। এরপর সেক্স করবো।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে সে বললো, যাহ! অসভ্য।

এম নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

বেঈমান

–এসএম আছাব আলী

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে ঘটে যাওয়া একটি সাধারণ অথচ সেকেলে প্রেমের ঘটনা নিয়ে লিখবো কি লিখবো না ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এ জন্যই, এখন প্রেমের গতি বেশ পরিবর্তিত এবং সর্বজনীন একটা ব্যাপার। মেয়েদের হাতে মেহেদি আকা প্রেমের বিজ্ঞাপন, বুকের ওড়না গলায় প্যাচানো আর ছেলেদের সঙ্গে চমৎকার মানানসই চালচলন। আমার শিমুআপা সেকেলে মহিলা, বিধবা, এক সন্তানের জননী। তার প্রেম নিয়ে গল্প কেমন লাগবে?

রেজাল্ট হয়েছে, উঠেছি। শীতের সকাল, লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এক অপরিচিত মহিলার কান্নার আওয়াজে উঠে পড়লাম। দেখি, আমার মায়ের ঘরে চৌকির ওপর বসে কম বয়সী এক মহিলা কাদছে আর আমার বিব্রত মা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কয়জন প্রতিবেশী মহিলা পাশে

দাড়িয়ে আছে, আমিও নিশ্চুপ তাদের মাঝে দাড়ালাম। দেখলাম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি ডুকরে ডুকরে কাদছে।

পরে জানলাম, সে আমার মায়ের মামাতো ভাইয়ের মেয়ে। নাম শিমু। কি একটা সমস্যার কারণে আমাদের বাড়িতে এসেছে এবং বেশ কিছুদিন এখানে থাকবে। সে বিধবা এবং তিন বছরের একটি পুত্র সন্তান তার শ্বশুরবাড়িতে রয়েছে। সন্তানের জন্য সে কাদতো। সত্যি বলতে কি, তাকে যখনই দেখতাম, তার দুই চোখে টলটল করছে পানি।

সে চুপচাপ বসে থাকতো সারাক্ষণ। তাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করতো। আমার চেয়ে চার পাচ বছরের বড় শিমুআপাকে দেখে মনে হতো পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী মানুষ। তখন তার জন্য যদিও আমার করার কিছুই ছিল না তবুও তার সমব্যথী হওয়ার চেষ্টা করতাম। আপার প্রতি আমার আগ্রহের কোনো সীমা ছিল না। তখন আমার তরুণ হৃদয়ে কি আশা ছিল জানি না। তবে এখন বুঝতে পারি জীবনের মহোৎসবের নিমন্ত্রণে এসে আমরা কতো বিচিত্র স্বাদে, কতো বিচিত্র রূপে, কতো অভাবনীয়, কতো অনির্বাচনীয় চেতনায় বিস্ময়ে কতোবার আত্মহারা হয়ে উঠবো তার কি শেষ আছে!

তিন মাস পরের ঘটনা। তখন চৈত্র মাস, মর্নিং শিফটে স্কুল। পাচ কিলোমিটার মেঠো পথ হেটে স্কুলে যেতে হয়। তাই খুব ভোরে উঠতে হতো। তখন আমাদের বাড়িতে কোনো ঘড়ি ছিল না। খাওয়া, পড়া, ঘুমানো, স্কুলে যাওয়া সবই আন্দাজে করতে হতো। তবুও সব কাজ ঠিক মতো হতো।

এক ভোরে শিমুআপা আমার ঘরে এসে বললেন, আমাকে একটা খাম এনে দেবে ভাই?

বললাম, একটা কেন, দশটা খাম লাগলেও বলো। তোমার যতো কাজ থাকে আমাকে বলো আপা।

চার পাচ দিন পরে ঠিক স্কুলে যাওয়ার আগে শিমুআপা আবার আমার ঘরে এসে একটি চিঠি বের করে আমার বইয়ের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, খুব সাবধানে এ চিঠি পোস্ট করবে। কাউকে দেখাবে না বা ভুলবে না।

বললাম, তুমি নিশ্চিত থাকো, কেউ দেখবে না। স্কুল থেকে কয়েক বাড়ি দূরে আমার মা পথ আগলে দাড়ালেন। বললেন, শিমুর চিঠি আমাকে ফেরত দাও।

বললাম, বারে, অপরের চিঠি তোমাকে দেবো কেন?

এ চিঠিতে শিমুর ক্ষতি হবে।

জিজ্ঞাসা করলে কি বলবো?

বলবে পোস্ট করেছি।

শিমুআপার চিঠি পোস্ট না করে মাকে দিলাম।

মানুষের সবটা কি জানা যায়? *শেষ* যেন কতো যুগ আগের কথা। সেই *মানুষ* এমন হতে হয়! সেদিন সারা পৃথিবীর পীড়িত মানব আত্মারা যেন নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠেছিল।

যাহোক, আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, এ ঘটনার ঠিক পরদিন সন্ধ্যায় দুটি বড়ো লাল বলদের গরুর গাড়ি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো। বন্দুক হাতে শিমুআপার বাবা আমাদের বাড়িতে ঢুকলেন আর গাড়োয়ানসহ অন্যজন বৈঠকখানায় বসলেন।

আপা তার বাবাকে দেখে আবারো উচু স্বরে কান্না শুরু করে দিলেন।

আমার মা কষ্ট করে রাধলেন ঠিকই কিন্তু আপার হৃদয়বিদারক কান্নার কারণে কারোরই খাওয়া হলো না।

শিমুআপা তার কঠোর নীতিবান বাবাকে ভালো করেই চিনতেন, তাই সুবোধ বালিকার মতো কাদতে কাদতে তার বাবার পেছনে গরুর গাড়ির দিকে চললেন।

গরুর গাড়ির সামনে দাড়িয়ে ছিলাম।

আপা আমার সামনে এসে দাড়ালো, কান্না থামালো এবং সবাইকে হতবাক করে দিয়ে আমার গালে খুব জোরে এক চড় মেরে বললেন, *বেঈমান*।

তারপর তিনি দ্রুত গাড়িতে উঠে বসলেন আর গাড়োয়ান গাড়ি জুড়ে দিয়ে শক্তিশালী বলদের পিঠে চাবুক মারলো। গাড়ি ছুটে চললো তিলকপুর রেল স্টেশনের দিকে এদিকে রাতারাতি আমার সামনে এক হিমালয়সম অনৈতিকতা হাজির হয়ে গেল যা আমার প্রাত্যহিক জীবনকে প্রতিনিয়তই এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিল।

শিমুআপা সম্পর্কে কিছু জানার আগেই তিনি চলে গেলেন এবং আমিও ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হয়ে করাচি চলে গেলাম। হয়তো বা শিমুআপাকে ভুলেও গেলাম।

আজ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলো মাথায় এসে ভিড় করছে। ১৯৬৯-এর শেষ দিকে বিয়ে করি। মাত্র আট মাসের মাথায় একটি অপমানজনক পরিস্থিতির কারণে বৌকে তালাক দিই। এটি আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয়, বেদনাদায়ক, ও কষ্টকর ঘটনা। এই একটি মাত্র ঘটনায় যতো কষ্ট পেয়েছি, সারা জীবনে অন্য কোনো ঘটনায় এতো বেশি কষ্ট পাইনি। সব সময় মনে হয়েছে শিমুআপার কথাই ঠিক – আমি একজন বেঈমান। পুরা ১৯৭০ সাল আমার আত্ম-যন্ত্রণার মাঝে কেটেছে, এমনকি কখনো আত্মহত্যার কথাও ভেবেছি।

তখন করাচিতে ছিলাম। বাড়ি এসে শিমুআপার সঙ্গে দেখা করবো, তার চিঠির কথা বলবো, সে চিঠিতে কি লেখা ছিল শুনবো। বলবো, তোমার গালি আমার জীবনে ফলে গেছে আপা, এখন আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু তা হলো না। ১৯৭১-এর ৮ মার্চ দুই মাসের ছুটিতে বাড়ি এসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ভিড়ে হারিয়ে গেলাম।

মানুষকে সহজ করে পেতে গিয়ে নিজেই জটিলতার মাঝে জড়িয়ে পড়েছিলাম। শিমু আপার উচ্চারিত *বেঈমান* শব্দটি আমাকে সারা জীবন তাড়া করেছে। সেই ১৯৫৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কতো মানুষ, কতো জীবন, কতো চরিত্র, কতো আনন্দ-বেদনা, কতো ভণ্ডামি দেখেছি তবুও সেই *বেঈমান* কথাটি কখনো ভুলিনি।

যাহোক, একদিন চাকরি জীবন শেষ হলো, অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়িতে বসবাস শুরু করলাম চোদ্দ বছর পার হয়ে গেল।

১৪১২ সালের বৈশাখ মাসে মামাবাড়িতে এক বিয়ের নিমন্ত্রণে খেতে গিয়েছিলাম। মামাতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে।

আমি একটু আগেই বিয়েবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। মামাতো ভাইটি খুব সচ্ছল নয়। বাড়ির বাইরে শাদামাটা শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। শামিয়ানার নিচে ডেকোরেটরের অনেক হাতল বিহীন চেয়ার ও টেবিল রাখা হয়েছে। সেসব চেয়ারে বসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গল্প করছিলাম।

বেলা এগারোটার দিকে বরযাত্রী আসবে। কিন্তু তার আগেই দেখলাম বাড়ির কাছে একটি শাদা কার এসে থামলো। কার থেকে এক বৃদ্ধ মহিলা নামলেন। সম্ভবত তার সাহায্যকারী অন্য একজন মহিলা হাত ধরে তাকে বিয়েবাড়ির দিকে আনতে লাগলো, নিমেষে অনেক আগ্রহী মানুষ তাকে ঘিরে ধরলো। পয়তাল্লিশ বছর পরও তার লম্বা গড়ন দেখেই চিনতে পারলাম তিনি সেই শিমুআপা।

দীর্ঘ দিন পর এক গরিব আত্মীয়ের বাড়িতে আকস্মিক অন্ধ শিমুআপাকে দেখে যেমন বিস্মিত তেমনি ব্যথিত হলাম। মনে হলো এই আমি, এই আমরা, এই সবার জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং নড়বড়ে। কবে একদিন দুদণ্ডের জন্য কাকে ভালো লেগেছিল, কবে হাসিমুখে কে কথা বলেছিল, কে দুঃখ দিয়েছিল, কে কতোটুকু দুঃখ পেয়ে কেদেছিল তারই হিসাব করতে মানুষ অসহায় হয়, রোগাক্রান্ত হয়, অন্ধ হয়, পঙ্গু হয় আবার এক সময় মৃত্যুবরণ করে।

আমি খুবই সচেতন, আমার শরীরে নিম্ন রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডে দুর্বলতা আছে। খুবই কম সময় যখন মানসিক চাপের মধ্যে থাকি তখন হঠাৎ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। পৃথিবীর আহ্নিক গতির মতো চোখের সামনে সব কিছু ঘুরতে থাকে এবং বমি লাগে। মন শক্ত করে অনেকক্ষণ চোখ বুজে চেয়ারে

হেলান দিয়ে বসে থাকলাম। এ অবস্থায় দুই চোখের দুই বিন্দু অশ্রু কালের হাতে তুলে দিয়ে নীরবে ভাবতে লাগলাম, কারো জীবনে এতো বেশি কষ্ট আসে কেন?

এক সময় বরযাত্রী এলো। বিয়ের অনুষ্ঠানাদি এবং খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ হলো। বৈশাখের প্রচণ্ড গরম ও ভিড় ঠেলে শিমুআপার কাছে গিয়ে বসলাম। পরিচয় দিলাম।

চিনতে পেরে কাছে টেনে বসালেন। অভিযোগ দিলেন। এতোদিন তার খোজ করিনি কেন?

তার সঙ্গে আমার কিছু কথা হলো। তারপর তার হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এলাম। আমার নানাজির আমলের একটি বড় পুকুর আছে। পুকুরে একটি শান বাধানো পুরনো ঘাট আছে। সে ঘাটে আম গাছের ছায়ায় বসলাম।

আমাদের হাতে খুব কম সময় ছিল। তাই আপাকে সরাসরি গরুর গাড়ি, আমাকে চড় মারা, *বেঈমান* বলা এ ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, দেখো আপা, একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন আমরা আরো বৃদ্ধ হবো এবং আমাদের মৃত্যু হবে। তোমার সেই চড় খাওয়ার পর যখনই কোনো দুঃখ পেয়েছি, কোনো কাজে বিফল হয়েছি বা কারো দ্বারা অপমানিত হয়েছি তখন বার বার তোমার কথা মনে পড়েছে। মনে হয়েছে, আমি আসলেই একজন ভণ্ড, একজন *বেঈমান*। তাই এতো কষ্ট পাচ্ছি।

আপা বললেন, না ভাই, তুমি নও, আসলে আমিই ছিলাম বেঈমান। আমি আমার প্রয়াত স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে বেঈমানি করেছি।

আপার দুটি হাত ধরে অনুরোধ করে বললাম, আমি তোমার স্বামী ও সন্তানের কথা জানতে আগ্রহী।

আপা বললেন, আমার ছেলের বয়স যখন দুই বছর তখন আমার স্বামী মারা যান। তার শোকের মাঝেই আমার একটি বছর কেটে যায়। এরপর একজন আমাকে ভালোবাসে। হয়তো অসম্ভব কিছু চিন্তা করেছিলাম। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্য, পাপ ও পুণ্যের আদি নিবাস হলো দেহ। আমার দেহ আমাকে অন্যায় পথে তাড়িত করেছিল। আমার জীবন, ধর্ম, সন্তান, পরিবার, বিশ্বাস, ভালোবাসা নিয়ে কেবল বিড়ম্বিতই করেছি নিজেকে।

বললাম, তারপর?

জীবন সায়াহ্নে এসে যৌবনকালের কলঙ্কিত স্মৃতি প্রকাশ করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও বললেন, তারপর আর কি! এক সময় বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সন্তানকে কেড়ে নিয়ে আমাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিল। আমার বাবা রাতের অন্ধকারে গরুর গাড়িতে করে তোমাদের বাড়িতে এনে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আমার বাবা জানতেন না আমি তখন স্বামী, সন্তান, ভালোবাসা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সম্ভব-অসম্ভব ইত্যাদি ভাবনায় জড়িয়ে পড়েছি এবং সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অক্লান্ত চিন্তায় অস্থির। একদিন সাহস করে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে সে চিঠি লিখেছিলাম।

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। আমাদের লম্বা ছায়া পুকুরের স্থির পানির ওপর ভাসছে।

আপা বললেন, সে রাতে তিলকপুর রেল স্টেশনে বাবা আমাকে নিয়ে *আমনুরা* মেইল ট্রেনে উঠলেন। পরদিন সকালে রাজশাহীতে এক খালার বাসায় উঠলাম। আমরা দুই বোন। তখন আমার মা জীবিত ছিলেন না। আমাকে নিয়ে বাবা খুবই বিব্রত ও বিরক্তিকর অবস্থায় পড়েছিলেন। সেসব কথা এখন ভাবতে খুব কষ্ট হয়। পেশায় শিক্ষক আমার খালু একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তার উৎসাহ এবং প্রচেষ্টায় এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম এবং নার্সের চাকরি নিলাম। কয়েক বছর খুব ভালোভাবে কেটে গেল। কিন্তু আবারও এক সমস্যায় পড়লাম।

বললাম, সমস্যা ছাড়া কোনো মানুষ নেই।

না ভাই, আমার সমস্যা ছিল ভিন্ন। এক কলেজ শিক্ষক আমার প্রেমে পড়লেন। তাকে বোঝালাম, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড় তাছাড়া আমি বিধবা, আমার ষোল বছরের একটি পুত্র সন্তান আছে ইত্যাদি। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। ভাবলাম, বয়স বেড়ে গেলেও প্রতিটি মানুষের একটা আলাদা জীবন

থাকে। শুধু সন্তান আর পরিবারই তার সব নয়। নিজের মতো করে বেচে থাকার আকাঙ্ক্ষা সব বয়সের মানুষের থেকেই যায়। অনেক না পাওয়ার বঞ্চনায় যেন হাহাকার করে উঠলো আদিম একটা মানুষের আত্মা। দীর্ঘ দিনের নৈরাশ্যের পর আজ যেন সে আবার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে তাকে। যুগের পর যুগ কেটে গেছে শুধু প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে। সেই কবে একদিন মানুষের জন্ম হয়েছিল বুভুক্ষার অতৃপ্তি নিয়ে! আবার বৃষ্টি হবে, ফুল ফুটবে গাছে। এতো আশা নিয়ে কর্মস্থলে আমরা পারিবারিকভাবে বিয়ের প্রস্তুতি নিলাম। তার মা বাবা ও আমার বাবাকে ডাকা হলো।

দীর্ঘ দিন পর বাবা খুব খুশি হলেন। তিনি খুব অকপট মানুষ ছিলেন। তার বাবাকে আমার সন্তানের কথাও বললেন। আমার সন্তান আছে এ কথা তার বাবা জানতেন না। তাই তিনি এ বিয়েতে রাজি হলেন না।

এমন সময় সংবাদ এলো বর-কনে চলে যাবে, আপনারা দোয়া করুন। এক বিয়ের গল্পের মাঝে আরেক বিয়ের তাড়া এলো। আমি অনুরোধ করে বললাম, খুব সংক্ষেপে কি বাকিটুকু বলা যায় না আপা?

আপা বললেন, আমার আর বিয়ে করা হলো না। এ শোকে বাবা মারা গেলেন। আমি স্বামী, সন্তান, পিতৃহারা হয়ে কেদেই চললাম। কাদতে কাদতে আমার চোখের সব পানি শুকিয়ে গেল, অন্ধ হয়ে গেলাম। অন্ধ হওয়ার পর আমার ছেলে আমার কাছে এলো। ছেলে এখন জাপান প্রবাসী। সে আমাকে এই মোটরকার কিনে দিয়েছে।

এদিকে বাবার অনেক সম্পত্তি পেয়েছি। আমার সব আছে, নেই শুধু সুখ। তাই আমার বর্গাচাষী গরিব প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের প্রচুর সাহায্য করি। এ মেয়ের বিয়েতেও এক লাখ টাকা দান করেছি।

আর বসে থাকা সম্ভব হলো না। খবর এলো বরযাত্রী এখন চলে যাবে। আমরা উঠে দাড়ালাম। আপার হাত ধরে বিয়ের প্যান্ডালের দিকে হাটতে লাগলাম।

আপা আস্তে করে বললেন, কবে কোন অসতর্ক মুহূর্তে তোমাকে একটা খারাপ কথা বলেছি, তা নিয়ে মনে কষ্ট পাবে কখনো ভাবিনি। আমি একজন অপরাধী মানুষ। আমাকে ক্ষমা করো ভাই।

অন্ধ আপা দেখতে পেলেন না আমার চোখে পানি এসেছে। বললাম, অমন করে বলো না আপা।

ষোল বছরের মেয়েটিকে আঠারো বছরের বলে বিয়ে দেয়া হয়েছে। এটাই গ্রাম্য সমাজের ঐতিহ্য। ব্যাকুল কান্নায় কনেবেশী মেয়েটি মা বাবার কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের কাছে এলো। আমরা দুজন অসুখী মানুষ এ নবদম্পতিকে সুখী হওয়ার দোয়া করলাম।

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে
asabalibd@yahoo.com

মেকি

-মুহম্মদ আবদুল হামিদ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে আমি এবং ফজলভাই দূরবর্তী একটি জেলা সদরে স্বাস্থ্য বিভাগীয় একটি হেড অফিসে চাকরি করতাম। আমি অকৃতদার এবং তিনি ছিলেন নতুন বিবাহিত। তিনি শুধু বৌ-এর গল্প করতেন। বলতেন, তার বৌয়ের মতো এতো সুন্দরী, গুণবতী এবং খাটি প্রেমিকা জগতে খুব কমই আছে। আমি অবিবাহিত এবং প্রেমপাগল ছিলাম বলে তার কল্পকাহিনী উৎকর্ণ হয়ে শুনতাম, আরো কিছু বলার জন্যে আলগি দিতাম।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে বিয়ে হয়েছে। চতুর্থ সপ্তাহে সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। বৌকে বাড়িতে রেখে এসেছেন প্রায় পাচ মাস হলো। একশ মাইল দূরে বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া ছিল সম্ভবের বাইরে। পথে বেরুলেই সমূহ বিপদ। রাস্তাঘাট, বৃজ, কালভার্ট ভাঙা, পথে পাঞ্জাবি, মুক্তি ও রাজাকারের ভয়। তাই নীল খামে চিঠি চালাচালি ছাড়া মিলনের আর কোনো উপায় ছিল না। তার বুক পকেটে বৌয়ের একটা পাসপোর্ট

সাইজ ফটো থাকতো, যা দিনের মধ্যে দশবার বের করে চুমু দিতেন এবং অনর্গল চেয়ে থাকতেন। তার এই অন্ধ পত্নী–প্রীতিকে আমি সানন্দে স্বাগত জানাতাম। কেননা এ সময়টায় আমার বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক ছিল যা যুদ্ধের ডামাডোলে আপাত চাপা ছিল। তার মতো আমিও যেন স্ত্রী সৌভাগ্যবান হতে পারি মনে মনে এমন কামনাই ছিল। তিনি বলতেন, তার স্ত্রীকে সীমাহীন ভালোবাসেন এবং তাকে ছাড়া তিনি কিছু চিন্তা করতে পারেন না।

যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাভাবিক হলে তাকে এ জেলারই একটি থানায় থানা কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হলো। তার সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেলেও এ খবরটি রেখেছি তিনি সেখানে সস্ত্রীক বসবাস এবং সুখে কালাতিপাত করছেন। বাহাত্তরের এপৃলে কামাল হোসেন (ছদ্মনাম) নামে একজন অফিস সহকারী আমাদের জেলা অফিসে যোগদান করলেন। তিনি ফজলভাই যে থানায় বর্তমানে আছেন সেখানে মাঠকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার একটি পা ইদানীং দুর্ঘটনায় প্রায় বিকল হয়ে যাওয়াতে কর্তৃপক্ষ তাকে মানবতার খাতিরে অফিস সহকারী পদে উন্নীত করে জেলা সদরে পোস্টিং দিয়েছে। তিনি প্রথম দিনই আমার সঙ্গে ত্বরিত দেখা করলেন একটি চিরকুট নিয়ে। তাতে ফজলভাই লিখেছেন – *দোস্ত, কামাল সাব তোমার আমার এলাকার লোক, নতুন স্থানে তুমি তাকে নানাভাবে সাহায্য করবে আশা রাখি। ইতি।*

লোকটির আচরণ খুবই ভালো। প্রথম আলাপেই খাতির হয়ে গেল। দুয়েকদিন পর তাকে একটি বাসা ঠিক করে দিলাম। স্ত্রী ও বছর তিনেকের একটি সন্তান নিয়ে বাসায় উঠলেন এবং সেখানে থেকে নিশ্চিন্তে চাকরি করতে থাকলেন। বৌ নিয়ে ওঠার পর কামালভাই কয়েকবার আমাকে দাওয়াত করেছেন, কিন্তু এখন–তখন করে যেতে পারিনি।

মাস ছয়েক পরে ফজলভাই আবার জেলা সদরে এলেন দশ দিনের একটি ট্রেনিং কোর্সে অ্যাটেন্ড করার জন্য। তিনি আমার মেসেই উঠলেন। অনেকদিন পর দেখা। দুই বন্ধুতে অনেক আলাপ। আলাপের প্রধান বিষয়বস্তু আমার বন্ধুর স্ত্রী–রত্ন। সে কথা আশা করি পাঠককে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কামাল সাহেব সম্বন্ধে টুকটাক খবর নিলেন আমার কাছ থেকে। কামাল সাহেব বৌ নিয়ে এসেছেন কিনা এবং আমি তার বাসা চিনি কিনা।

বললাম, বাসা আমিই ঠিক করে দিয়েছি, চিনবো না কেন।

অফিসে আমরা তিনজন দেশি প্রায় এক সঙ্গেই চলি, ক্যান্টিনে বসে আলাপ করি।

ফজলভাই ট্রেনিং শেষের দুইদিন আগে একদিন দুপুরে আমার রুমে এসে চুপিচুপি বললেন, দোস্ত ওঠেন, এক জায়গায় যেতে হবে।

আমি বললাম, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি দেখছেন না, কোথায় যাবো?

কোনো কথা নয়, আগে চলুন।

অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অফিসের বাইরে এসে দুইজন রিকশায় উঠলাম।

এবার তিনি বললেন, কামাল সাহেবের বাসায় চলুন।

আমি অবাক। কামাল সাহেব অফিসে, আর আমরা চলেছি তার বাসায় তাকে না জানিয়ে।

তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, একটি অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি, আপনি শুধু দেখবেন, অবাক হবেন এবং ভাবতে থাকবেন। নো কমেন্ট প্লিজ।

দোচালা একটি টিনশেড ঘর দরজায় টোকা দিতেই ত্রিশোর্ধ, স্বাস্থ্যবতী, হাফ সুন্দরী মহিলাটি দরজা খুলে দিয়েই অবাক হয়ে বললেন, একি আপনি, কোত্থেকে, কিভাবে? সঙ্গে উনি কে?

ভেতর থেকে একটি বাচ্চার কণ্ঠ, আম্মু কে এসেছে?

বোঝা গেল বাসায় আর কেউ নেই। দুইটি রুম। মধ্যে পার্টিশন। আমাকে বাইরের রুমে বসতে বলে ফজলভাই মহিলাটিকে নিয়ে দ্রুত অন্দরে চলে গেলেন। বাচ্চাটির হাতে একটি বিস্কুটের প্যাকেট ধরিয়ে দেয়া হলো। সে খেলছে। এ ঘর ও ঘর করছে। আমি একটি পুরনো পত্রিকার একাংশ কাছে পেয়ে নাড়ানাড়ি করছি।

ওদিকে ভেতরে যুদ্ধাবস্থা শুরু হয়ে গেছে। হাসাহাসি, ফিশফিশানি, গোঙানি ও দাপাদাপির শব্দ শোনা যাচ্ছে টিনের চালের বৃষ্টির শব্দকেও ছাড়িয়ে।

আমি লজ্জা, ভয় ও মানসিক উত্তেজনায় ছটফট করছি, এ আমি কোথায় এলাম?

পাচ-দশ-বিশ করে প্রায় তিরিশ মিনিট পর অবশেষে ঝড় থামল। দুইজনে ফ্রেশ হয়ে মুচকি হেসে আমার সামনে এসে বসলেন।

বন্ধুটি মহিলাকে বললেন, কুসুম, উনি (আমাকে দেখিয়ে) আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, আজকের এ ঘটনা আমরা তিনজন ছাড়া পৃথিবীর কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। তুমি মনে ভয় রেখো না।

ফেরার পথে রিকশায় ফজলভাইকে বললাম, আপনি না বলতেন স্ত্রীকে আপনি প্রাণাধিক ভালোবাসেন, এই বুঝি ভালোবাসার নমুনা। কিভাবে আপনি এমনটি করতে পারলেন?

তিনি বললেন, স্ত্রী এবং প্রেমিকা দুইটি ভিন্ন জিনিস, সে তুমি বুঝবে না। এখনো তো বিয়ে করোনি, প্রেমও করোনি। পরকীয়ায় যে কি মজা!

অফিসে ফিরতে দুই ঘণ্টা ব্যয় হয়ে গেল। বৃষ্টি তখনো থামেনি। বন্ধু তার কক্ষে চলে গেলেন। বারান্দা দিয়ে আমার রুমে আসার পথে কামালভাইকে দেখলাম নিবিষ্ট চিত্তে ফাইলে নোটশিট লিখছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তার যে সর্বনাশটি হয়ে গেল, তার নিজের পার্সোনেল ফাইলে যে লাল কালি পড়ল, সে খবরটি তিনি রাখেন না।

রাতে মেসে শুয়ে শুয়ে ফজলভাই আরো বললেন, কামাল সাহেব তার অধীনে চাকরি করতেন, তার শহরে থাকতেন, তখন থেকেই মহিলার সাথে পরিচয় এবং প্রণয়। অন্য সব কিছুই হয়েছিল, বাকি ছিল শুধু আসল কাজটি। আজকের সুযোগে তাই সেরে নিলেন। এর দুইদিন পর ট্রেনিং শেষে বন্ধু তার থানায় চলে গেলেন।

এদিকে কিছুদিন পর আমার মেসে আবাসন সমস্যা দেখা দিলে কামাল সাহেব আমাকে তার বাসায় থাকার প্রস্তাব দিলেন। বৃদ্ধ মায়ের অসুখ থাকায় সেবার জন্য স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাসা খালি, বর্তমানে তিনি একা আছেন, কাজের মহিলা রান্নাবান্না করে দেয়। ওই অলুক্ষণে বাসা! মনে মনে দ্বিধা করার আগেই কামাল সাহেব আমার বেডিং নিজে বয়ে নিয়ে তার বাসায় তুললেন। আমি ওঠার কয়েকদিন পরই তিনি বললেন, হামিদ ভাই, বুড়া বেটির পাক ভালো লাগে না। চলেন একটা জোয়ান মাতারি রাখি।

আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করে পরদিনই একটি নাদুস-নুদুস যুবতীকে নিয়োগ দেয়া হলো। একদিন খাওয়ার সময় ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কামালভাই, আপনার বৌ আপনাকে কেমন আদর করে?

জবাবে তিনি তার স্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অনেক বর্ণনার ফাকে এটাও বললেন, এমন সতী নারী কদাচ দেখা যায় না।

শুনে কৃতার্থ হলাম।

এদিকে দিন যতোই গড়াতে লাগলো, যুবতী বুয়ার সঙ্গে তার ফষ্টিনষ্টি ততোই বাড়তে লাগলো। একদিন বিকেলে অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কড়া নাড়ার দুই মিনিট পর ঘর্মাক্ত কলেবরে আলুথালু বেশে কামালভাই দরজা খুললেন। বলা বাহুল্য, রাধুনিটি তখন ভেতরেই ছিল। এলেমেলো বিছানা, অগোছালো নারীদেহ দেখে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হলো না, একটু আগে এখানে কি ঘটেছে। মেয়েটি ধীরপদে বেরিয়ে গেল।

কামালভাই বললেন, কি করবো ভাই, বিদেশে বৌ ছাড়া থাকলে এমন এক-আধটু মৌজ না করলে চলে কি?

আমি বললাম, তাই তো।

এর কয়দিন পর কামালভাইয়ের বালিশের তলায় তার স্ত্রীর লেখা একটি চিঠি পেলাম। তার অনুমতি ছাড়াই চিঠিটি পড়ে দেখলাম।

স্ত্রীটি চিঠিতে প্রেম–পিরিতির অনেক বাগাড়ম্বরের পর এক জায়গায় লিখেছে শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, ভালো খাওয়া–দাওয়া করিও। কিন্তু আমার মাথার দিব্যি রইলো উপোস থাকিলেও কাজের বুয়া রাখিও না।

অথচ কামালভাই–এর মধ্যেই কাজের বুয়া রেখেছেন এবং আর যা করার তাও করে নিয়েছেন।

এসব দেখে আমার মাথাটা যখন ঘোলাটে, তখন আর একটি সংবাদে আরো বিব্রত হতে হলো।

নিয়তির কি খেলা! ফজল ভাইয়ের সদর থেকে খবর এলো গতসপ্তাহে তার স্ত্রী অন্য অফিসের এক ব্যাচেলর কর্মকর্তার সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। আরো অদ্ভুত কথা, ম্যাডাম নাকি নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে ভাব এলো, স্বামীর ঔরসের সন্তান পেটে নিয়ে পরপুরুষের হাত ধরে ঘরের বের হয়ে সেই ভাবীও প্রমাণ করলেন, স্বামী ও নাগর ভিন্ন জিনিস।

ফজলভাই বলেছিলেন এসব আমি নাকি বুঝব না, কেননা আমি প্রেম ও বিয়ে কোনোটিই করিনি।

বলাই নগুয়া, নেত্রকোনা থেকে

Mr T

তার যে আমার শরীরের প্রতি এতো লোভ ছিল এটা আমার জানা ছিল না। আমি কখনো বুঝতেও পারিনি।

তাকে আমিও খুব ভালোবাসতাম তবে সেটা তিনি আমার আত্মীয় হিসেবেই অন্য কিছু হিসেবে নয়, তার সঙ্গে আমি কোনো অশ্লীল কথাবার্তাও কখনো বলিনি। ভাবী দেবরের মধ্যে কতো রকম বাজে আলাপ হয়, সেটাও কখনো হয়নি। আমি তাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম।

তার দেখাশোনা আমাকেই করতে হতো। তাই অনেক দিন জেগে থাকলে রাতের খাবার দিতাম।

একদিন তিনি আমাকে বললেন, ব্যক্তি জীবনে আমি খুব অসুখী কিন্তু আমি আমার বৌকে খুব ভালোবাসি।

তার কথার মানে আমি বুঝলাম না। প্রায় ঠাট্টার ছলে আমাকে সেক্সুয়াল গল্প বলার চেষ্টা করলে আমি লজ্জায় চলে আসতাম। তার স্ত্রী ও সন্তানরা আমার খুব প্রিয় ছিল এবং আমি তাদের খুব ভালোবাসতাম। সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই আমার কাল হয়ে দাড়ালো।

আমি পড়লাম মরণ ফাদে।

এখন নিজেকে খুব ছোট মনে হয়।

এক রাত দেড়টায় মোবাইলটা বেজে উঠলো।

হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, আমি আপনাকে চাই।

নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে নিকৃষ্ট একটা কথা শুনবো এটা আমি কখনো ভাবিনি। কথাটা শোনার পর আমার হৃৎপিণ্ডটা খুব বেশি ওঠানামা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কিছুই বলতে পারলাম না।

রাজনৈতিক কাজে তিনি প্রায়ই এখানে আসা যাওয়া করতেন। আমার সঙ্গে সম্পর্কটাও ছিল চমৎকার। তাকে আমি খুব ভালো মানুষ হিসেবে জানতাম। আমি দেখতে কতোটা সুন্দর ছিলাম জানি না তবে অনেকেই আমার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু কখনো কারো প্রলোভনে পড়িনি। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। নিজের চরিত্র নিয়ে আমি খুব গর্বিত ছিলাম।

থাক সে কথা।

পরের দিন আমার মোবাইল আবার বেজে উঠলো।

রাজনৈতিক কারণে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। যেখানে যেতেন সেখান থেকে মোবাইল করতেন। আমিও আস্তে আস্তে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি।

উল্লেখ্য, আমার স্বামীর দিক থেকে খুব অসুখী ছিলাম। আমার স্বামী ছিলেন একজন মদ্যপায়ী। প্রতিদিনই মদ খেয়ে গভীর রাতে বাসায় ফিরতেন। বাসায় বৌ-বাচ্চা আছে এটা তার মনেই থাকতো না। অধিকাংশ রাতে আমরা আলাদা বিছানায় থাকতাম। এতো বেশি মদ খেতো যে তার হুশ থাকতো না।

এদিকে মোবাইলে আত্মীয়র প্রেম আলাপ চললো। আস্তে আস্তে আমি তার পাতা ফাদে পা দিই। আমাদের বাড়ি তার আসা-যাওয়াও বেড়ে গেল।

ফোনে প্রায় প্রতি রাতে কথা হতো। তিনি ফোন করতেন আমাকে এবং বলতেন, পরকীয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেম। এতো ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি তো আছি।

তারপর থেকে প্রায়ই আমরা মিলিত হতাম। তবে চুমু খাওয়া, জড়িয়ে আদর করা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকতো। দেখা না হলেও মোবাইলে চলতো কথা। দিনে-রাতে দুই তিনবার কথা হতো। বেশির ভাগ কথা গাড়িতে হতো ও ফোন করতেন এবং গান চালিয়ে আমি চুপ করে থাকতাম বলে তিনি লতার গানটা বেশি ক্যাসেটে বাজিয়ে শোনাতেন।

যখন তিনি ঢাকায় থাকতেন কতোদিন রাতে একটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত কথা বলেছেন, মোবাইল কিছুতেই ছাড়তে চাইতেন না।

একদিন রাত একটার দিকে ফোন করে বললেন, আসুন না আমরা গল্প করি।

আমি প্রথমে আপত্তি করি। কিন্তু তার অনুরোধে বাধ্য হয়ে তাকে আসতে বলি। তারপর বারান্দায় বসে গল্প করছি, হঠাৎ তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠোট চুষতে লাগলেন।

তারপর যা হবার তাই হলো। ওই রাতে কেউ নিজেকে রুখতে পারলাম না। ওই একটা বারই আমরা মিলিত হলাম। তিনি নিজেও খুব অনুতপ্ত হলেন। মনে হলো নিজের কাছে নিজেই পরাজিত হলাম।

আমার স্বামী ঢাকায় ছিলেন। আমি ভাবলাম তার ফোন। প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে উঠে মোবাইল ধরলাম কিন্তু স্বামী না আমার সেই আত্মীয়। আবারও সেই উক্তি - *আমি আপনাকে চাই*।

এ শোনার পর কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান আসলো আমি নিজেকে বিছানার পাশে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না আমি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে মেঝেতে পড়ে আছি।

মোবাইলে বিভিন্ন রকম কথা হতো। খুব নিকট আত্মীয় হওয়ায় তার থাকা-খাওয়া দেখা-শোনার সব বিষয় আমাকেই দেখতে হতো। তখন তিনি দশ দিনের মতো ছিলেন। এদিকে এ কথাটা আমি কাউকেই বলতে পারছি না। নিজেই কষ্ট পাচ্ছি। আবার সকাল বেলা তার সঙ্গে আমার দেখা। লজ্জায় তার সামনে চোখ তুলে চাইতেও পারতাম না।

এভাবে তিনি সব সময় আমাকে ফোন করতেন। আমি কিছু বলতেও পারতাম না। তাকে বোঝাতাম আপনার স্ত্রী ও বাচ্চারা আছে, সেখানেই ফিরে যান। ওখানেই সুখ-শান্তি পাবেন। অন্যের লোভকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে আমি নিজে হেরে গেলাম।

আমি আজও তাকে খুব ভালোবাসি। সত্যিই আমি তাকে খুব ভালোবাসি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

গিফট

–ওয়াহেদুজ্জামান

য্যা মে–ইন বিৎজারে বইরি, মার্সসি।

আমি ওসব ছাইপাশ খাই না, ধন্যবাদ। বলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলেন জ্যাক শিরাক।

টনি ব্লেয়ার কোনো রকমে গলায় ঢেলে দিয়ে এমন মুখভঙ্গি করলেন যেন কেউ জোর করে তার মুখের মধ্যে এক গ্লাস তেতো করলার জুস ঢেলে দিয়েছে। গ্লাস টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বললেন, মুসলিম ব্লাড ইজ নো মোর টেস্টি, বস। আমার আর ভালো লাগে না। শেরিও আগের মতো ডিপ কিস করে না।বলে আমার মুখে নাকি ব্লাডের গন্ধ লেগে থাকে।

কাম অন টনি, মেয়ে মানুষের কথায় কান দাও কেন! লারা আমাকে ড্রাকুলা বলে ডাকে তাই বলে কি আমি এমন অ্যামিউজিং ড্রিংকস ছেড়ে দিতে পারি। বলে সামনের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলে ভঙ্গি করে হেসে উঠলেন প্রেসিডেন্ট বুশ।

রক্ত লেগে থাকা দাতগুলো লাল দেখাচ্ছে। ঠোটের দুই কোষেও কয়েক ফোটা রক্ত লেগে আছে। মিস এঞ্জেলা মার্কার চুপচাপ বসেছিলেন। বুশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মিসেস লারা ইজ রাইট মি. প্রেসিডেন্ট।

ভ্যালেনটাইনস ডে উপলক্ষে বিশ্ব নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন মি. বুশ। বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে আজ ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে চান। বসন্তের পড়ন্ত বিকালে ঝিরিঝিরি বাতাসে বসে ফুরফুরে মেজাজে কুড়মুড়ে পটেটো ক্র্যাকার্সের সঙ্গে ড্রিংক করতে করতে খোলামেলা আলোচনা করবেন। তাই হোয়াইট হাউসের গার্ডেনের সবুজ চত্বরে খোলা আকাশের নিচে টেবিল সাজিয়ে বসেছেন।

বোতলটা হাতে নিয়ে কর্ক খুলে খালি গ্লাস আবার ভর্তি করেন মি. বুশ। বোতলের লেবেল পড়তে পড়তে চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে রাশিয়ান ভাষায় কি বললেন মি. পুটিন বোঝা গেল না। লেবেলের উপর বড় করে লেখা হিউম্যান ব্লাড।

সাপ্লায়ার – জারকাওই ব্রাদার্স, ডেথ স্কয়ার, বাগদাদ।

হেড অফিস : হাইডিং রোড, তোরাবোরা হিল, আফগানিস্তান।

বিশ্ব নেতাদের সামনে চেয়ারে বসবেন কি না এই সংশয় নিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন জালাল তালাবানি। এবারে হাতজোড় করে বলে উঠলেন, প্লিজ স্টপ স্যার। সাদ্দাম ইজ ডেড, প্লিজ স্টপ নাও।

হোয়াট! সাদ্দাম ডেড ! হু কিলড হিম! চোখ কপালে তুলে বললেন মি. বুশ।

সিংহের মতো গর্জন করা সাদ্দাম তো সেই কবেই মারা গেছে। গুহা থেকে যাকে ধরে আনা হয়েছে সে সাদ্দামের ডামি স্যার! তার বিচার আচারের দরকার নেই। তাকে ছেড়ে দিলে ইরাকিরাই টুকরো টুকরো করে কেটে খেয়ে ফেলবে। একটানা কথাগুলো বলে গেলেন জালাল তালাবানি।

হোয়াই ডু ইউ সে দালাল। তোমরা হিউম্যান ফ্লেশ খাও! নির্লিপ্তভাবে শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তিনি।

বর্বর আমরা না তোমরা। তোমরাই মানুষের রক্ত চুষে খাও। মনে মনে কথাগুলো আওড়ালেন এক সময়ের বিজ্ঞ আইনজীবী জালাল তালাবানি।

এমন সময় ঢিলেঢালা ময়লা কাপড়, গায়ে চাদর জড়ানো, পাকা দাড়িতে মেহেদির রঙ করা এক লোকের গলায় দড়ি বেধে টানতে টানতে এনে প্রেসিডেন্টের পায়ের কাছে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন পারভেজ মোশাররফ।

আপনার জন্য ভ্যালেনটাইন গিফট এনেছি স্যার।

লোকটা একবার বুশ আর একবার ব্লেয়ারের দিকে তাকাচ্ছে আর চোস্ত ভাষায় কি সব বকে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট ডিড হি সে, মোশাররফ?

ডোন্ট বিলিভ হিম স্যার, সে নিরীহ পপি চাষী নয়–একেবারে জাওয়াহিরির ডান হাত। নাইন ইলেভেনের মাস্টার মাইন্ড। বিগ অ্যাচিভমেন্ট স্যার।

পারভেজ মোশাররফকে কানিং ফকস বলে মনে হয় মি. ব্লেয়ারের। যেই ধরা পড়ছে তাকেই মাস্টার মাইন্ড বলে প্রচার করা হচ্ছে। আর কতোজন যে মাস্টার মাইন্ড পাওয়া যাবে। অনলি ক্রাইস্ট নোজ।

আর ইউ শিওর মি. মোশাররফ, এই ব্যাটাই ছিল মাস্টার মাইন্ড। জিজ্ঞাসা করলেন মি. ব্লেয়ার।

ইয়েস স্যার। হি ইজ, আনটিল উই হ্যাভ এনাদার ক্যাচ।

কথার ফাকে সামনে তাকিয়ে মি. বুশ দেখলেন শাড়ি পরা, চোখে চশমা এক মহিলা সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করছে। হাতের ইশারায় ভদ্রমহিলাকে আসতে দিতে বললেন। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে অ্যাপয়ন্টমেন্ট না নিয়ে আসার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন টেবিলের কাছে দাড়িয়ে।

আই অ্যাম শেখ হাসিনা স্যার, ফরমার প্রাইম মিনিস্টার। আমি স্যার, বেয়াইয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। বেয়াইনের মুখে শুনলাম আপনি ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা করবেন তাই ছুটে না এসে...

কথা না বাড়িয়ে কাজের কথা বলুন। বললেন মি. বুশ।

আমি স্যার একটু বেশি প্যাচাল পাড়ি, প্যাচালে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছি। বিশ্বাস না হলে গিনেস বুক খুলে দেখতে পারেন জীবিত এবং মৃত প্রাইম মিনিস্টারদের মধ্যে একমাত্র আমারই টাং–এর উপর কোর্টের ইনজাংশন আছে। গর্বিত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতে বলতে হাতে ধরে রাখা A-4 সাইজের কাগজখানা টেবিলের উপর মেলে ধরলেন। সাবজেক্ট–এর জায়গায় বোল্ড করে লেখা Please save my life - save my country.

আমার সোনার বাংলা আজ তালেবানে ভরে গেছে স্যার। মা ছেলে মিলে আমাকে মেরে ফেলতে চায়। আমার চারদিকে গ্রেনেড রেইন করেছে তবু প্রাণে বেচে গেছি। ওই যে কথায় বলে না স্যার – *রাখে আল্লা মারে কে!*

এটা আপনাদের ইনটারনাল ব্যাপার ম্যাডাম, আমি কি করতে পারি।

আমার দেশ আপনার ইনভেনশন কামনা করি স্যার। প্লিজ, কনসিডার মি এনাদার হামিদ কারজাই এবং চেয়ারখানা ফিরিয়ে দিন। ওই চেয়ারটাই আমার First and lost last Love। ভ্যালেনটাইনস ডে–তে এটাই আপনার কাছে প্রার্থনা স্যার। আমার হারানো ভালোবাসা, আমার lost love-কে ফিরিয়ে দিন।

সরি, বললেন মি. বুশ। আপনি বরং প্রাইম মিনিস্টার সোনিয়ার কাছে যান।

নট সোনিয়া, মনমোহন সিং ইজ প্রাইম মিনিস্টার। শুধরে দেন মি. ব্লেয়ার।

ওই মনমরা সিংটা একটা ভীতুর ডিম স্যার। ক্ষোভের সঙ্গে নামটা উচ্চারণ করেন শেখ হাসিনা।

ওই লোকটার কিছু করার সাহস নেই। আপনি কিছু করেন। শেষবারের মতো অনুরোধ করে বলেন, আওয়ার কান্ট্রি ইজ নট ভেরি ফার ফ্রম আফগানিস্তান। প্লিজ আর একবার ভেবে দেখুন।

এমন সময় মি. ব্লেয়ারের মোবাইলটা রিনিঝিনি সুরে বেজে উঠল। অন করে কানে চেপে ধরতেই মুখমণ্ডলের রেখা পাল্টে গেল। অস্পষ্টভাবে কয়েকটা শব্দ মুখ থেকে বের হলো বম্ব! ডাউনিং স্ট্রিট! চেয়ার থেকে উঠেই দৌড়ানো শুরু করলেন। শেরি মাই লাভ, আই অ্যাম কামিং...।

এই টনি, কোথায় যাও! পেছন থেকে ডেকে উঠলেন মি. বুশ।

লন্ডন। দৌড়াতে দৌড়াতেই জবাব দিলেন তিনি।

মুসা নবীর লাঠি ছাড়াই ছপছপ করে পানির ওপর পা ফেলে আটলান্টিক পার হয়ে এলেন ব্লেয়ার। দৌড়াচ্ছেন তো দৌড়াচ্ছেনই। সামনে শাদা আলখেল্লা পরা দাড়িওয়ালা কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে থমকে দাড়ালেন তিনি। সে কি পথ ভুলে তবে মিডল ইস্টে ঢুকে পড়েছে!

ওহ নো আই অ্যাম নট এ গে...।

গলা দিয়ে ঘড় ঘড় করে শব্দ কটা বের হতেই ব্লেয়ার বুঝতে পারেন তিনি তার বিছানাতেই শুয়ে আছেন। ম্যাডাম শেরি পেছন থেকে এক হাত দিয়ে তার গলা পেচিয়ে ঘুমিয়ে আছেন আর ম্যাডামের এক হাটু তার

পশ্চাৎদেশে লেগে আছে। গলার ঘড় ঘড় শব্দে ম্যাডামেরও ঘুম ভেঙে যায়। স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে বলেন, অ্যাই টনি, অমন করছো কেন!

স্বামীর কপালে হাত দিয়ে দেখেন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। অন্ধকারে বিছানার এক পাশে খুলে রাখা ব্রা–টা হাতে বাধেন। ওটা তুলে নিয়ে স্বামীর ঘাম মুছে দিতে দিতে বলেন, স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছো বুঝি! স্তনের মাঝখানে ঝুলে থাকা ক্রসটা কপালে ঠেকিয়ে বলেন, ভয়ংকর কিছু নাকি?

হ্যা, শেরি, স্বপ্নে দেখলাম বুশের সঙ্গে বসে ঢকঢক করে ব্লাড খাচ্ছি। বলে পুরো স্বপ্নের ঘটনা স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করতে থাকেন মি. ব্লেয়ার – কিভাবে তিনি মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মিডল ইস্টে ঢুকে পড়েছেন।

তারপর ওই লোকগুলোর মধ্যে থেকে *এততো বড় লম্বা বলে* এক হাত নাভীর কাছে নিয়ে দাড়ির সাইজ দেখিয়ে বলতে লাগলেন, দাড়িওয়ালা লোকটা আমাকে বালির ওপর উপুড় করে ফেলে দিয়ে একটানে আমার প্যান্ট হাটুর নিচে নামিয়ে ফেলে। বলে নিজের পাছাটায় হাত বুলান। কেন জানি জায়গাটা ভারি ভারি লাগছে এখনো।

ফিক করে হেসে ফেলেন ম্যাডাম।

ওমা তোমাকে! হাসি আর চেপে রাখতে পারেন না, খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলেন, ভ্যালেনটাইন গিফট ছিল বুঝি!

ইউ নটি গার্ল। ম্যাডামের কোমরের ওপর দিয়ে এক পা চালান করে দিয়ে দুই হাত দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে হো হো করে হেসে উঠেন মি. টনি ব্লেয়ার।

সউদি আরব থেকে

হিরোইন

আমি একজন মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সরকারি পলিটেকনিকের তরুণ শিক্ষক। বিস্ময়কর হলেও সত্য আমার ভালোবাসার জগৎ গড়ে উঠেছে বাংলা সিনেমার এক নায়িকাকে নিয়ে। প্রতি বছরই তাকে নিয়ে লিখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পাই। এটা কি লেখার যোগ্য, লিখলেও প্রকাশযোগ্য শিক্ষকদের এতো অধঃপতন? ইত্যাদি ভাবনা।

তিনি ঢালিউড নায়িকা সাদিক পারভীন ওরফে পপি। তিনি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি... গান গেয়ে *কুলি* সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটান। অবাক হলাম। এতো সুন্দর মেয়ে হয়! উচ্চতা, মানানসই বুক, চোখ ইত্যাদি মিলিয়ে অসাধারণ। তাকে দেখার জন্যই বাংলা সিনেমার ত্রিশ বত্রিশটি সিডি ক্যাসেট কিনলাম। নিকটজনেরা আমার বাংলা সিনেমা নিয়ে রং তামাশা করে। তারা মনে করে বাংলা সিনেমার একনিষ্ঠ ভক্ত আমি।

ঠিকই আছে। আমি সিনেমার নই, ভক্ত ওই পপির। তিনি বৃষ্টিতে ভিজে নাভির নিচের অংশ যখন দেখান, জানি না নায়করা কেন বেহুশ হয় না। এতো চমৎকার দৃশ্য মুম্বাই–র নায়িকাদেরও পাই না।

বর্তমানে বিয়ে করতে যাবো। প্রতিটি মেয়ের মাঝে নায়িকা পপির ফটোকপি খুজে বেড়াই, ব্যর্থ হই। ফলে বয়স বাড়ছে অনিবার্যভাবে। বাড়ছে স্বজনদের ধৈর্যের পরীক্ষা। আশাবাদী, একদিন তার মতো একজন সত্যিই পেয়ে যাবো।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
চট্টগ্রাম থেকে

সম্ভব

–জীবন

বাসার সবাই ছিল বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে। আমার তখন সামনে ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা। তাই গেলাম না। আমার জান–এর বাসা ছিল সামনের বিল্ডিং–এ। সবাই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় এসে তাকে ইশারা করলাম বাসায় আসতে। সে তখন সারা দিন জানালার কাছে থাকতো আমাকে দেখার জন্য। সে দশ মিনিট পর এলো। পরনে তার বাবার প্যান্ট এবং কামিজের ভেতর শার্ট।

সে এসেই আমাকে কামিজ খুলে দেখালো।

তাকে শার্ট–প্যান্ট পরা অবস্থায় পরীর মতো লাগছিল। ভ্রম কাটতেই বললাম, তোমাকে খুব সেক্সি লাগছে। কাছে এসো না, একটু আদর করি।

এর আগে তাকে খালি বাসায় অনেক দেখেছি। কিন্তু কখনো সীমা অতিক্রম করিনি। সেদিন কি যে হলো! সারা মুখে আদর করে যেই না তার শার্ট ধরলাম খুলতে, সে বাধা দেয়ার মৃদু চেষ্টা করলো। এরপর শার্ট খুলে তাকে শুইয়ে দিলাম খাটের মাঝামাঝি। বাধা দেয়ার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে তার বাধা দেয়ার শেষ শক্তিটুকুও উধাও। একটু পর যখন তার দিকে মুখ তুলে চাইলাম তখন বিন্দু বিন্দু ঘামে তার মুখমণ্ডল একাকার। সত্যি, কি যে অপূর্ব ছিল সে মুহূর্তটা! ঠিক তখনই মাথায় বুদ্ধিটা এলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সাইক্লোনের জন্য প্রস্তুত?

সে প্রথমে কিছুই বললো না। জানি, সে বাধা দেবে না। আবারো জিজ্ঞাসা করলাম। এবার সে হ্যা সূচক মাথা নাড়ল।

বললাম, মুখে বলো।

সে বললো, আমাকে গ্রহণ করো।

দেখো, ভেবেচিন্তে বলো, এরপর যদি তোমার সঙ্গে অন্য ছেলেদের মতো বেইমানি করি?

উত্তরে সে যা বললো তাতে মনটা ভরে গেল।

অন্য ছেলেদের মতো নও বলেই তো নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

তখন আমি তার ঊরু দুপাশে নিয়ে পজিশন সেট করি। আবারো বলি, করব? যদি বিয়ে না করি?

সে বললো, না করলেও কোনো দুঃখ নেই। কারণ আমার সব তোমার জন্য।

এ কথা বলার পরপরই তাকে প্যান্ট পরিয়ে হুক লাগিয়ে দিলাম এবং নিজেকেও ঠিক করে ফেললাম।

বললাম, জান, তোমাকে আজ পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, আমার প্রতি তোমার কতোটুকু বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলাম এবং আজীবন রাখব। আমি কখনোই তোমাকে কবুল বলার আগে এভাবে গ্রহণ করবো না। তুমি যে বললে আমি অন্যদের মতো নই, এটাই তার প্রমাণ।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললাম। সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরলো প্রচণ্ড জোরে। এতো জোরে সে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সে এতোটা অবাক হয়েছিল যে তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হচ্ছিল না। তাকে শোয়া থেকে উঠিয়ে শার্ট এবং কামিজ পরিয়ে দিলাম। সে তখন মোহগ্রস্তের মতো তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

তাকে যখন বিদায় দিলাম তখনো সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। একটা কথাও বলেনি। সে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে পাহারারত বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার দিয়ে বললাম, দোস্ত, আজ আমার চরিত্রের পরীক্ষায় পাস করলাম। আমি জানের বিশ্বাস রেখেছি।

তখনই মাগরিবের আজান দিল। পরে তার মুখ থেকে শুনলাম, সে নাকি বাসায় কিসের ওপর দিয়ে হেটে গেছে নিজেও জানে না। বাসায় গিয়ে অনেকক্ষণ শীতের মধ্যেও ফ্যান ছেড়ে শুয়ে ছিল আর আমার কথাগুলো ভাবছিল। তাদের ভাড়াটিয়ারা তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করছিল, কি হয়েছে রে, তোকে এমন লাগছে কেন? কেউ কিছু বলেছে?

সে তখন তাদের সব বলেছিল। তারা নাকি শুনে বলেছিল, আমি খুব ভালো ছেলে। আমার মতো ছেলে হয় না, অন্য কেউ হলে এটা পারত না ইত্যাদি।

পরে তার সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন সে আমার অনেক প্রশংসাও করলো। সত্যিই সেদিন নিজেকে এতো সুখী মনে হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারবো না। মনে হচ্ছিল পুরো পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তুমি সেদিন শোয়া থেকে উঠে এভাবে তাকিয়ে ছিলে কেন আমার দিকে?

সে উত্তর দিল, ভাবছিলাম, এও কি সম্ভব?

পূর্ণ নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

এইচআইভি পজিটিভ ক্লাব

তুমি নাকি হাত পড়তে পারো। দেখো তো আমার হাতে কি আছে?

একটা মাত্র বিয়ে।

বিয়ে তো মানুষ একবারই করে জীবনে।

আমার হাতে দেখো তিনটি বিয়ে। তিনবারই তোমাকে করবো।

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী আমি তখন। সহপাঠী সজীবের সঙ্গে প্রায়ই এ ধরনের বাক্যালাপ হতো আমার। ভালো লাগার শুরু তখন থেকেই। বন্ধুত্বের রুপালি বলয়ে হাত রেখে কখন যে ছুয়ে দিয়েছি ভালোবাসার সোনালি বলয় নিজেরাও বুঝতে পারিনি। ভালোবাসার তীব্র সুখ অনুভব করলাম দুইজন পুরো চারটি বছর ভরে। জানলাম ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমান ভালোবাসায় ঝংকার তোলে বীণার সপ্তমীর মতো। প্রতিদিন দেখা করতাম আমরা। দিনের প্রতিটি বিষয় শেয়ার করতাম। সজীব থাকতো মিরপুরে আমাদের বাড়ি ছিল ইব্রাহিমপুর। কাছাকাছি বাসা আর রোজ দেখা সাক্ষাৎ করার মাঝে দুই পরিবারেই দ্রুত প্রকাশ পেয়ে গেল আমাদের সম্পর্কের কথা। আর একজন দুজন করে সবাই আপত্তি জানাতে লাগলো আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্তে। আমরা সমবয়সী ছিলাম বলেই হয়তো।

প্রেমের কোনো সংজ্ঞা নেই। প্রেম মানে না বাধা নিষেধ। পরিবারের সবার মত উপেক্ষা করে, সকল বন্ধন ছিন্ন করে ভালোবাসার বন্ধনে জড়ানোর প্রতিজ্ঞা করি আমরা। সজীবের চোখে আমি ছিলাম স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, আমাকে দেখলে নাকি বোঝা যায় স্রষ্টা কতো পবিত্র, কতো নিখুত। তার এসব আবেগ-আপ্লুত উপমা আর ভালোবাসার কথাগুলো সারাক্ষণ আমার মনে বাজতো পিয়ানোর টুংটাং ধ্বনির মতো। পারিবারিক ও সামাজিক সব প্রতিবাদ প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের প্রেম টিকে ছিল নক্ষত্রের মতো ধ্রুব। কিন্তু ভালোবাসার সুখ সইলো না কপালে। কথায় বলে, কপালের নাম গোপাল। আমার সবটুকু ভালোবাসা সম্ভবত এই গোপাল ব্যাটাই লুটে নিয়েছিল নিজের ভাগে।

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে থেকে পাস করে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি হলাম ইডেন কলেজে। অনার্স থার্ড ইয়ার চলাকালীন একদিন নিউ মার্কেটে কলেজের পুরনো এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। কলেজে তার সঙ্গে আমার কখনো তেমন সখ্য ছিল না। কিন্তু অনেকদিন পর দেখা হতেই মনে হচ্ছিল আমরা আসলে খুব ভালো বন্ধু হতে পারতাম। নিউ মার্কেট এক নাম্বার গেটে কোণার দোকানটায় দাড়িয়ে ফুচকা-লাচ্ছি খেতে খেতে নানান রকম গল্প করছিলাম দুইজন। সময়টা ছিল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। চার কি পাচ দিন পর থার্টি ফার্স্ট নাইট। বান্ধবী নিভা আমাকে প্রস্তাব করলো থার্টি ফার্স্ট নাইটটা ওদের বাড়িতে থাকার জন্য। কিন্তু আমি জানি আমার মা কখনো কারো বাড়িতে রাত কাটানোর অনুমতি দেবেন না। তাই নিভা সেদিন আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসে সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমার মাকে পটিয়ে ফেললো। শেষ পর্যন্ত আমার মা রাজি হলেন শুধু একটি রাত নিভাদের বাড়িতে থাকতে দিতে।

বিকালের মধ্যে নিভার বাড়ি গিয়ে দেখলাম, খুব আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। ওরা চারটি মেয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতো ধানমন্ডিতে। দুজন স্টুডেন্ট, দুজন চাকরি করে। তাদের মুখে শুনলাম রাতে আরো

কয়জন মেয়ে আসবে এখানে থাকার জন্য। এক সঙ্গে খুব মজার আড্ডা হবে। সন্ধ্যার পর সব মিলিয়ে আমরা আটজন মেয়ে জমে গেলাম ওখানে। তুমুল আনন্দ, উচু ভলিউমে গান শোনা – সব কিছু প্রচণ্ড ভালো লাগছিল আমার। জীবনে কখনো এসব আনন্দ উপভোগ করা হয়নি আগে। রাত যখন ঠিক এগারোটা বাজলো, নিভা প্রস্তাব করলো বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসার। সুমি নামের একটি মেয়ে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, তার গাড়িতে আমরা আটজন উঠলাম এর ওর কোলে বসে।

রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরার পর সুমি বললো পাশের গলিতে তাদের আরেক বান্ধবী তানজিনা থাকে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সবাই এক সঙ্গে নামলাম ওই বাড়িতে। আমাদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য কোক বিস্কিট আর চানাচুর দিল। ঠাণ্ডার সময় চা না দিয়ে কোক দিল কেন বুঝতে পারছিলাম না। তবে কোকটুকু খেলাম ভদ্রতা করে। দশ কি পনেরো মিনিট পর মনে হতে লাগলো আমায় মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখে আবছা ঘোর লাগতে শুরু করেছে। এক সময় লক্ষ্য করলাম একটি ছেলে এসে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। এই বাড়িতে যে এত পুরুষ মানুষ ছিলো এতক্ষণ বোঝা যায়নি। অচেতন আমার সাথে তখন কে কি করেছে কিছুই টের পেলাম না, তবে হালকা মনে পড়ে বারবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু লাভ হয়নি।

পরদিন যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো দেখলাম গায়ে কোনো কাপড় নেই। আমার পরনের কাপড়গুলোও খুজে পেলাম না ঐ ঘরে। মোবাইল নিয়ে নিভাকে ফোন করলাম। বললাম, অন্তত বাড়ি ফেরার মতো কিছু কাপড় পাঠাও আমাকে। একটু পর একজন এসে আমাকে এক সেট কামিজ দিয়ে গেল। ওগুলো পরে ব্যাগটি কাধে নিয়ে নিঃশব্দে চলে এলাম আমি বাড়িতে।

প্রথম দুটি দিন কাটলো আমার সম্পূর্ণ উন্মাদের মতো বিভ্রান্ত হয়ে। সজীবের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করিনি, বাড়িতে কারো সঙ্গে একটি বর্ণও উচ্চারণ করিনি। শুধু ভাবলাম বসে বসে, এটা কি হলো? কেন এমন হলো? ভেবে দেখলাম এই কথা যদি সজীবকে বলি, তাহলে ও আমাকে ভুল বুঝবে কিন্তু এই ঘটনার কষ্টে সে আমার চেয়েও বেশি ব্যথিত হবে। ভালোবাসায় হয়তো করুণা যোগ হবে।

থার্টি ফার্স্ট নাইটের দুঃস্বপ্ন কাটেনি তখনো, চোখের জল গাল ভিজিয়ে গলা পর্যন্ত ধুয়ে নেমে যাচ্ছে প্রতিদিন শত শত বার করে। ঠিক আটদিন পর আমাদের বাড়িতে আমার নামে একটি চিঠি এলো। অবাক হয়ে ভাবলাম আমাকে চিঠি পাঠালো কে? নিজের ঘরে গিয়ে খাম খুললাম, সাদা কাগজে একটিমাত্র বাক্য লেখা – *ওয়েলকাম টু এইচআইভি পজিটিভ ক্লাব*।

স্তম্ভিত আমি দ্বিতীয়বারের মতো থমকে গেলাম। এ কোন আঘাত এলো আমার জীবনে! বাবা-মাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম। সমাজকে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম। ভালোবাসার জন্য জীবন বিসর্জন দেয়ার কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু মরণ ব্যাধির যে জীবাণু প্রবেশ করেছে নিজ দেহে তাকে প্রেমিকের দেহে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারলাম না। হৃদয় আর বিবেক বাধা দিল এক সঙ্গে। নিষ্ঠুরের মতো ফিরিয়ে দিতে হলো সজীবকে। বললাম, পরিবারের মতের বাইরে যেতে পারবো না।

এখন আমার রক্ত জুড়ে এইডস-এর তাণ্ডব, মৃত্যু দুয়ারে অপেক্ষমাণ। সজীবের হৃদয় ভাঙার কষ্ট আমাকে এইডস-এর কষ্টের চেয়েও বেশি কাতর করে। তবু পারি না দূষিত বেদনার একটি ফোটা ভাগ দিতে আমার ভালোবাসার মানুষটিকে। নিঃশ্বাসের মতো একান্ত নিকট, বুকের কাছে সর্বক্ষণ জমে থাকা প্রেমটি যে এভাবে নিষিক্ত হবে বিরহের নোনা জলে – কল্পনাও করতে পারিনি কোনোদিন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

বব

–নাজমুন নাগীব ধ্রুব

আমাদের বাসার পাশেই নানার শখের বাগান। আম, কাঠাল, পেয়ারা ও অন্যান্য ফলের গাছ। বিভিন্ন ঋতুতে নানার বাগানে প্রচুর ফল হতো। ফলে বাগানে প্রায়ই চুরিও হতো।

একদিন রাতে, বাগানে নয়, আমাদের বাসায়ই চুরি হলো।

পরদিন নানা একটি ট্রেনিং দেয়া ছোট অ্যালসেশিয়ান আনলেন। আমাকে দিলেন কুকুরটি পুষতে। এটার নাম রাখলাম বব। সেই থেকে ববকে পুষি।

আস্তে আস্তে ববের সঙ্গে আমার খুব ভাব জমে গেল। মাঝে মধ্যে ববের সঙ্গে খেলা করি। আমি বল ছুড়লে সে মুখে পুরে আমাকে বলটা এনে দেয়। সে আমাকে দেখলে লেজ নাড়ে। বব নামে ডাকলে তার চোখে মুখে আনন্দ প্রকাশ পায়।

এক রাতের কথা। ববের চিৎকারে আমাদের ঘুম ভাঙে। দেখলাম বব একটা চোরকে তাড়া করছে। আমি, বাবা ও নানা দৌড়ে গেলাম ববকে সাহায্য করতে।

চোরটা একটা লাঠি নিয়ে ববকে মারতে গেল। কিন্তু পারলো না। ববকে বাড়ি না মারতে পেরে চোর আমাকে মারতে গেলে লাফ দিয়ে বব সামনে এসে পড়লো। আঘাত আমার গায়ে না লেগে ববের গায়ে লাগলো। তার মাথা ফেটে গেল। কিন্তু চোর পালাতে পারলো না।

নানা ও বাবা এসে চোরকে ধরে ফেললো।

আমরা ববকে পশু হাসপাতালে নিয়ে গেলাম।

এই ঘটনার পর থেকে ববের আদর আমাদের বাসায় বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে তার দুষ্টুমিও বেড়ে গেল। আমরা সবাই তার দুষ্টুমি উপভোগ করি।

একদিন আমি আর আম্মা মার্কেটে যাচ্ছি। আমাদের বাসা থেকে বায়তুল মোকাররম মার্কেট বেশি দূরে নয়। তাই আমরা হেটে মার্কেটে যাচ্ছিলাম। কেউ খেয়াল করলাম না যে বব আমাদের পিছু নিয়েছে। সেগুনবাগিচা থেকে বায়তুল মোকাররম মার্কেটের রাস্তায় সব সময় ভিড় লেগেই থাকে। মার্কেটে যেতে ভিড়ের মধ্যে এক সময় এক পকেটমার আম্মার ব্যাগ কেটে মোবাইল আর ঘড়ি নিয়ে নিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের নজর এড়ালেও ববের নজর এড়ালো না। সে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গিয়ে পকেটমারটিকে ঝাপটে ধরলো।

বেচারা চোরও ভয়ে চিৎকার।

সেখানে দ্রুত লোকের ভিড় জমে গেল।

পকেটমারটার কাছে আম্মার মোবাইল ও ঘড়ি পাওয়া গেল।

চোরটিকে আম্মা পুলিশে দিলেন।

এরপর থেকে আমাদের বাসায় ববের কদর আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল। সবাই তাকে দেখলে এটা–ওটা খেতে দেয় ও আদর করে। বলতে গেলে সেই থেকে বাসায় ববকে নিয়ে আদরের প্রতিযোগিতা চলে।

তাই ভালোবাসা দিবসে আমাদের ববকে প্রাণঢালা ভালোবাসা।

সেগুনবাগিচা, ঢাকা থেকে

অটোগ্রাফ

–সাহাব উদ্দিন আহমদ

কলাতিয়া কলেজের ডিগ্রির ছাত্র আমি। হাবাগোবা, সহজ–সরল–শান্ত ছিলাম বরাবরই। ঠোটের কোণায় সব সময় হাসি লেগেই থাকতো। এ জন্য অনেকেই আমাকে পছন্দ করতো ও ভালোবাসতো।

একদিন তো শ্রদ্ধেয় লেকচারার নুরুল আমীন স্যার ক্যাম্পাসে আমার কাধে হাত রেখে বলেই ফেললেন, সাহাব উদ্দিন, তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি।

স্যারের এই কথাটি চিরদিন মনে থাকবে যদিও অন্যান্য লেকচারাররাও বেশ ভালোবাসতেন।

কলেজের বড়আপুরাও বেশ পছন্দ করতেন। সময় পেলে তারা আমাকে কাছে ডাকতেন। সাবু, চল লাইব্রেরিতে যাই, চল গল্প করি ইত্যাদি।

যারা এক সঙ্গে পড়তো তারা তো আছেই। সময় কাটতো বেশ ব্যস্ততার মাঝে। অনেকেই বলতো, আমার ঠোটের কোণে হাসি এবং কথা বলার ভঙ্গি বেশ চমৎকার।

একই ডিপার্টমেন্টে পড়ি আমি আর সুমা। সুমার পাশের বাড়ির শিউলী আমার এক বছরের জুনিয়র। সুমার সঙ্গে আসতো বলে তার সঙ্গেও বেশ পরিচয় ছিল। শিউলী সব সময় আদবের সঙ্গে সম্মান দিয়ে বিনয়ের সুরে কথা বলতো। কলেজে প্রতিদিন যে কোনো অছিলায় আমার সঙ্গে দেখা করতো। অন্তত একটা সালাম দিতো।

বাংলা বছরের শেষ দিন আমার সঙ্গে দেখা হতেই শিউলী বললো, ভাইয়া, কাল নববর্ষ, ক্যাম্পাসে আসবেন না?

বললাম, ঠিক নেই।

শিউলী বললো, ঠিক নেই কেন, আসবেন এবং পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে আসবেন। আমিও শাড়ি পরবো।

(হাসতে হাসতেই বললাম), তুমি শাড়ি পরবা, না হাফপ্যান্ট পরবা সেটা তোমার ব্যাপার। লেখাপড়ার বেশ চাপ। সকালে বাসুদেবস্যারের কাছে ইংরেজি পড়ে হয়তো ক্যাম্পাস হয়ে যাবো।

বাংলা নববর্ষ। পায়জামা ও পাঞ্জাবিই পরলাম। শিউলী না বললেও পরতাম। ভোরে পড়তে গেলাম। পড়া শেষ করে রুম থেকে বের হয়েই দেখি শিউলী দাড়িয়ে আছে।

শুভ নববর্ষ ভাইয়া।

শুভ নববর্ষ। এখানে দাড়িয়ে আছো কেন? আমি তো ক্যাম্পাসেই যেতাম।

মন মানছিল না কখন আপনি ক্যাম্পাসে যাবেন, তাই চলে এসেছি।

শিউলীর খুব কাছাকাছি দাড়ালাম। শিউলীর স্তন দুটি এবং আমার শরীরের দূরত্ব সামান্যতম। তার শ্বাস–প্রশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্তনদ্বয়ের ওঠানামা বেশ লাগছে। গোলাপি শাড়ির মেরুন পাড়। খুব ভালো লাগছে। শাড়ি বেশ সুন্দর করে পরেছে। মাথার বেণীটাও দক্ষ হাতে গড়া। সব মিলিয়ে সাজগোজের কমতি ছিল না। যাকে বলে মাঞ্জা মারা।

শিউলীর হাতে দুটি ডায়েরি। একটি ফুলসহ, একটি ফুল ছাড়া। ফুলসহ ডায়রিটা আমাকে দিয়ে বললো, এটা আপনার জন্য। নববর্ষ লেখাটাও ফুলের পাপড়ি দিয়ে। বেশ শ্রম দিয়েছে বোঝা যায়। ফুলের পাপড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, ফুল তো সব সময়ই সুন্দর। আজ তোমাকে সব কিছু থেকে বেশি সুন্দর লাগছে। তাকে খুশি করার জন্যই বললাম, ফুলের পাপড়ি রেখে তোমার পাপড়িতে হাত বোলাতে ইচ্ছা করছে। একটু দেখবো নাকি পরশ দিয়ে।

শিউলী সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যায়। সে সম্মতিও দিতে পারে না আবার নাও করতে পারে না।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে সরে আসি। তোমাকে শাড়িতে বেশ লাগছে। প্রতিদিন শাড়ি পরে এসো।

কি যে বলেন ভাইয়া, প্রতিদিন শাড়ি পরে কি কলেজ করা যাবে! যদি যেতো তাহলে ঠিকই আসতাম যেহেতু আপনি বলছেন।

আমি কি এতোই গুরুত্বপূর্ণ? বললাম।

শিউলী বিনা সংকোচে আগ্রহ নিয়ে বললো, অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ডায়রিটা ও কলম দিয়ে বলে, ভাইয়া অটোগ্রাফ।

আমি হতবাক। এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। জীবনে কারো কাছে অটোগ্রাফ নিইনি আর এখনই যে কাউকে অটোগ্রাফ দিতে হবে সেটা ভাবিনিও।

বললাম, অটোগ্রাফ তো দেন যারা নায়ক, ভালো খেলোয়াড়, কবি, সাহিত্যিক, বিখ্যাত ব্যক্তি ও যারা স্টার। আমি কেন?

শিউলী বললো, আপনিও বিখ্যাত ব্যক্তি, নায়ক, খেলোয়াড় এবং সুপারস্টার কারো কাছে।

ভাবতে থাকি কি করা যায়। একটু নীরব হয়ে যাই। হঠাৎ আমার বন্ধু মফিজুল ইসলাম প্রিন্সের দেয়া বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় অটোগ্রাফটি মনে পড়ে। তৎক্ষণাৎ ওটাই নকল করি।

হৃদয়ের গভীর থেকে

অকল্পনীয় শুভেচ্ছাসহ নববর্ষ।

জীবনের প্রথম অটোগ্রাফ এবং এই (স্বাক্ষর) পর্যন্ত কাউকে দিইনি।

শিউলী ডায়রিটা নিয়ে একটি চুমু খেল।

বললাম, চুমু খেলে কেন ডায়েরিতে?

সে বললো, আমি ডায়রিতে চুমু খাইনি। আমি চুমু খেয়েছি..., না থাক।

থাকবে কেন?

অন্যদিন বলবো। আসলে আপনি কিছুই বোঝেন না। চলেন ক্যাম্পাসে।

মনে মনে বলি, আমি সব বুঝি শিউলী। আসলে বুঝতে চাই না। তুমি আমার স্বপ্নের রানীর মতো নও, যাকে আমি অকৃপণভাবে ভালোবাসবো, ভালোবাসবো জীবনভর, ভালোবাসার সমুদ্রে সাতার কাটবো জুটি বেধে।

তোমাকে বুঝতে চাইনি এই জন্য যে, আমি তোমাকে ঠকাতে পারবো না। তোমাকে নিয়ে মিথ্যে ভালোবাসার খেলায় মেতে উঠতে পারি না। আমার বিবেক আমাকে মেতে উঠতে দেয় না। আর এখানেই আমি পরাজিত।

রোম, ইটালি থেকে
subu0007@hotmail.com

বিড়াল ও রূপালী

–সত্যজিৎ শীল

ছোটবেলায় একটি বিড়াল পুষতাম। আমার ঠাকুমা বিড়ালটির একটি নাম দিয়েছিল। নামটি মনে নেই। বিড়ালটিকে খুব ভালোবাসতাম। বিড়ালের সঙ্গে মাছ দিয়ে মজা করতাম। মাছ বিড়ালটির সামনে ধরে যত উচু করতাম বিড়াল সামনের পা তত উপরে উঠাতো মাছ ধরার জন্য। বিড়ালকে সঙ্গে নিয়েই ঘুমাতাম। আমাদের ঘর ছেড়ে বিড়াল কোথাও যেত না। খাবার জিনিস খোলা পড়ে থাকলেও বিড়াল কখনো খেতো না।

একদিন মজা করে বিড়ালের পায়ে রাবার বেধে দিলাম। কয়েক দিন পরে বিড়ালের পা ফুলে গেল। পায়ের যন্ত্রণায় বিড়ালের খাওয়া–দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রাবারটা খুলতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বিড়ালের নরম পায়ের সঙ্গে রাবারটা এমনভাবে গেথে গেছে, তা আর খোলা সম্ভব হলো না।

একদিন বিড়ালটা মারা গেল। খুব কেদেছিলাম বিড়ালটির শোকে।

রূপালীকে আমি জীবন দিয়ে ভালোবেসেছি। কি করিনি তার জন্য আমি? তারও একটা নাম রেখেছিলাম। যখন যা মন চেয়েছে খাইয়েছি, দিয়েছি। রূপালী আমাকে কথা দিয়েছিল, আমাকে ছেড়ে কোনো দিন যাবে না।

দীর্ঘ পাচ বছর পর রূপালী বুঝতে পারলো আমি গরিব। তাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল সে। আমার কি আছে, না আছে কোনো কিছুই অজানা ছিল না রূপালীর। দীর্ঘ পাচ বছর ধরে এই অভিনয়ের কি দরকার ছিল? এ প্রশ্ন আমি রূপালীকে করতেই পারি।

বিড়ালের পায়ে রাবার বেধে বিড়ালের ক্ষতি করেছিলাম। বিড়ালটা আমাকে ছেড়ে যায়নি। রূপালীর উপকার ছাড়া কোনো ক্ষতি করিনি। রূপালী আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, বেচে থাকাই অর্থহীন। তবুও বেচে আছি।

পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য এই যে, পশুকে ভালোবাসলে বেইমানি করে না। মানুষ করে।

রাজবাড়ী থেকে

আমেরিকান ডারলিং

–ইউনুস

অ্যারাবিয়ান আমেরিকান অয়েল কম্পানির আরামকোর একটি কম্পাউন্ডে আমাদের কম্পানির কাজ। কাজ করি হাউজিং ক্লার্কে। নাইট ডিউটি আমার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর। প্রচুর পেপার ওয়ার্ক করতে হয়। কাজের সময় কারো ফোন আমার কাম্য নয়।

জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ, কনকনে শীত, বাইরে প্রচুর বৃষ্টি। এক কাপ কফি নিয়ে বসেছি। হঠাৎ আমার বন্ধু কামালের ফোন। আমাদের কম্পানিতেই কাজ করে, একটু দূরে। সে আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে। খুব হ্যান্ডসাম এবং মেয়ে পটানোতে ওস্তাদ। বন্ধুরা তাকে বলে কন্যারাশি। কথা বলাতে তার কোনো ভণিতা নেই।

ফোনে বললো, ওই মাস্টার, ভ্যালেনটাইন মানে কিরে?

সরাসরি বললাম, জানি না। তুই এই শব্দ কোথায় পেয়েছিস?

কামাল বললো, আর বলিস না, আমার আমেরিকান ডারলিং একটা সুন্দর কার্ডে লিখেছে ইউ আর মাই ভ্যালেনটাইন।

আগামীকাল তোকে এর মানে জানাবো বলে ফোন রেখে দিলাম।

কফি নিয়ে বসে চিন্তা করছি ভ্যালেটাইনস কার্ড আমি দেখেছি আমার বসের বাসায় আর দেখেছি আল খোবার শোলা সেন্টারে আল মানহিল বুক শপে। একদিন বুক শপে বাংলাদেশি সেলসম্যানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই সুন্দর লাল রঙের কার্ডগুলো কিসের। সে ভালো উত্তর দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল বিদেশিরা প্রচুর কার্ড কিনছে।

পরের দিন ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করলাম ভ্যালেনটাইনস কার্ড সম্পর্কে। ম্যাডাম স্কুল টিচার। তিনি বললেন, মনে হয় তোমাদের দেশে এখনো এর প্রচলন শুরু হয়নি।

ম্যাডামের কথায় যা বুঝলাম তাহলো এটা ভালোবাসার কার্ড। এই ভালোবাসা প্রেমিক–প্রেমিকা, স্বামী–স্ত্রী মোটকথা একে অন্যকে ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে দিতে পারে।

ফোনে কামালকে বিস্তারিত বললাম এবং কার্ড কোথায় পাওয়া যাবে তাও বললাম।

উপসাগরীয় যুদ্ধ বা ইরাক কুয়েত যুদ্ধের সময় সউদি আরবে হাজার হাজার আমেরিকান পুরুষ এবং নারী সৈন্য এসেছিল। আমাদের কম্পানি তখন সৈন্যদের খাবারের কনট্রাক্ট পেয়েছিল। কামাল ওয়েস্টার্ন

ডাইনিং-এর হেড ওয়েটার। সেখান থেকেই এক আমেরিকান ললনার প্রেমে পড়ে। ওই সময় অনেকেই নারী সৈনিকদের প্রেমে পড়েছিল। এতে শ্রী লংকার ছেলেরা ছিল এগিয়ে। দেশিরাও কম ছিল না।

কামাল প্রতিদিন ফোনে তার প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলতো। সে মাঝে মধ্যে কামালের রুমে যেতো। তখন এমন পরিস্থিতি ছিল কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাতো না। কিচেনের শেফ মাইকেল রোজারিও আমাদের এলাকার লোক। আমেরিকান স্পেশাল প্যাকলাঞ্চ কামাল প্রায়ই রুমে নিয়ে যেতো।

একদিন কামাল ফোনে বললো, লিনডা তোকে দেখতে চায়। শোন তুই আজ বিকালে আল খোবার শপিংমলের পাশে বাসকিন রবিনস-এ আসবি। লিনডা আইসকৃম পছন্দ করে।

বিকেলে বাসকিন রবিনসে গিয়ে দেখলাম কামাল আর লিনডা বসে গল্প করছে। লিনডাকে দেখে আমার কথা বের হচ্ছে না। এই তাহলে কামালের আমেরিকান ডারলিং?

কামাল আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। কামালকে মনে মনে গালি দিলাম শালা, আর মেয়ে পেল না, এ যে দেখছি আমেরিকান কালীতারা। আইসকৃম খেতে খেতে অনেক কথা হলো।

লিনডাকে হারডিস-এ ডিনার করার অনুরোধ করলাম। সে বললো আধা ঘণ্টা পরে তাদের গাড়ি আসবে। অন্যদিন এক সঙ্গে ডিনার করবো। কামাল এবং লিনডাকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে আমি পাশের দোকানে চলে গেলাম। লিনডা চলে যাবার পরে আমরা পার্কের খামের ওপর বসে গল্প শুরু করলাম।

ওকে কেমন লাগলো? কামাল জিজ্ঞাসা করলো।

তোর পছন্দ দেখে অবাক হচ্ছি, আমি বললাম।

তুই বুঝবি না, ওর কথা বলার মধ্যে সব সময় রোমান্টিকতা থাকে। আমার চোখে ও বিশ্ব সুন্দরী। দেখেছিস ওর চুল বাধার স্টাইল? কামাল বললো।

মনে মনে বললাম যার নয়নে যারে লাগে ভালো। হয়তো কামাল ঠিকই বলেছে।

রাতে বিছানায় গিয়ে কামালের কথা ভাবতে লাগলাম। এই সেই কামাল যে ওর এক দূর সম্পর্কের বোনের সঙ্গে চার বছর প্রেম করে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেছে। কামালের স্ত্রী সামিয়া অত্যন্ত রূপসী। কামালের প্রেমে সামিয়া না পড়লে তাদের বিয়ের প্রশ্নই উঠতো না। অথচ সে এখন করছে কি? তাকে ভালোভাবে কিছু বলতে হবে।

যুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। ওই সময় সিএনএন দেখানো হতো বাহরেইন চ্যানেলে। সিএনএন-এর সংবাদ দেখছি। হঠাৎ কামাল রুমে ঢুকেই বললো, তোর জন্য সুখবর আছে। লিনডা বলেছে তার এক বান্ধবী তোর সঙ্গে প্রেম করবে। সে এখন জুবাইল নেভাল বেইস-এ আছে। এ সপ্তাহেই এসে যাবে।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রাগ করে বললাম, তোর কি আর কোনো কাজ নেই? দেখ কামাল, আমার বৌ আছে, আমি আমার বৌকে খুব ভালোবাসি। সে আমার হৃদয়ের রানী। আমার প্রেমিকার দরকার নেই।

কামাল এ কথা শুনে হকচকিয়ে গেল।

টিভি অফ করে তাকে বললাম, তুই কি সেই কামাল যে প্রতি সপ্তাহে প্রেমিকার চিঠি না পেলে অসহায়ের মতো বসে থাকতি, ছটফট করতি। এই তোর ভালোবাসার প্রতিদান? এখনো সময় আছে। এসব ভুলে যা। এ খবর তোর বৌ জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবে।

কামাল কিছু না বলেই চলে গেল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। অনেক আমেরিকান সৈন্য চলে যাচ্ছে। কামালের প্রেমিকারও চলে যাওয়ার দিন ঠিক হয়ে গেছে। যাবার আগের দিন কামালের ঠোটে ঠোট রেখে বলেছে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তোমার কথা মনে থাকবে।

কয়েকদিন পর কামালকে বললাম, তোর আমেরিকান ডারলিং-এর কথা ভুলে যা। সে তোর সঙ্গে টাইম পাস করেছে। দেশে গিয়ে তোর মতো আরেকজন ধরবে।

আমার কথায় কামাল খুশি হলো না।

মাঝে মধ্যে কামালের নামে প্রেমপত্র, ফটো, শুভেচ্ছা কার্ড আসতে লাগলো। কামাল আনন্দেই দিন কাটাতে থাকলো।

অনেকদিন হয়ে গেছে, আমিও এসব ভুলে গেছি। সকলেই যার যার কাজে ব্যস্ত। একদিন বিকেলে আমি ডিউটি থেকে এসে রুমে দেখি কামাল মনমরা হয়ে বসে আছে। তাকে বললাম, তোর মন খারাপ কেন? বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

কামাল বললো ওসব কিছু না। লিনডা লিখেছে সে এখন তার আগের প্রেমিকের সঙ্গে লিভ টুগেদার করছে। আমাকে ভুলে যেতে বলেছে।

আমি তো আগেই বলেছিলাম এমনই হবে। তোর আমেরিকান ডারলিং তোকে মদন বানিয়েছে বুঝলি? সব কিছু ভুলে যা। শোন কামাল, তুই ভাগ্যবান, সামিয়ার মতো সুন্দরী মেয়ে তোর বউ। তুই সামিয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিস, তোর ভালোবাসার কি এই মূল্যায়ন? এখনো সময় আছে মন থেকেই ওই মেয়েকে ভুলে যা।

কামাল বললো, নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

বললাম, সন্ধ্যায় মার্কেটে গিয়ে একটি ভ্যালেনটাইনস ডে-র কার্ড কিনবি, সুন্দর করে একটি ভালোবাসার চিঠি লিখবি। তোর বৌয়ের জন্য ভালো গিফট এনে আমাকে দিবি। আমি এগুলো দেশে পাঠিয়ে দেবো।

কিছুদিন পর আল খোবার শোলা সেন্টারে বাংলা পত্রিকা কিনতে গিয়েছি। বাংলাদেশি সেলসম্যান বললো দেশী ভাই, যায়যায়দিন এই প্রথম ভালোবাসা সংখ্যা বের করেছে। সুন্দর গল্প আছে। এক কপি আমি রেখে দিয়েছি, আপনি নিয়ে যান। তাকে দাম দিতে চাইলাম, সে নিল না। রুমে এসে পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে জানলাম ভ্যালেনটাইনস ডে-র মর্মকথা। বড় ভালো লাগলো।

কামাল আমাকে ফোনে বললো, তুই কি আমার এখানে আসতে পারবি? তোকে সুন্দর একটি জিনিস দেখাবো।

বললাম পরে আসবো। ব্যাপার কি?

কামাল বললো। সামিয়া ওগুলো পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। ওর একটি সুন্দর ফটোর পেছনে লিপস্টিক দিয়ে চুমু দিয়েছে। সুন্দর করে হার্ট একেছে। লাল গোলাপ ছিড়ে দিয়েছে। ও লিখেছে তুমিই আমার ভালোবাসা। আমি অনেক খুশি আমার বৌকে নিয়ে। তুই আবারো প্রমাণ করলি তুই আমার ভালো বন্ধু। তোকে অনেক ধন্যবাদ।

বললাম তোরা সারাজীবন সুখে থাক এই কামনাই করি।

সউদি আরব থেকে

পিচ্চি

–নিলুফার কবির

আমার এক আত্মীয় তার কাজের বুয়াকে নিয়ে একদিন বেড়াতে এসেছিল আমাদের বাসায়। বাসায় তখন আমি একা। ছেলে, সাহেব দু'জন অফিসে। বড় মেয়ে তার বাসায়। ছোট মেয়ে কলেজে।

সারা বাসা ঘুরে এসে বুয়া বললো, খালাম্মা বাসায় একা আপনে কেমনে থাহেন? খারাপ লাগে না?

উত্তরে বললাম কি করবো বলো? ছুটা বুয়া কাজ করে চলে যায়, ছেলেমেয়েরা কি সব সময় কাছে থাকতে পারে? আমাকে একটা ছোট্ট মেয়ে এনে দিও তো। আদর-যত্ন করে সারা দিন কাছে রাখবো।

কয়দিন পর দেখি বুয়া সত্যি সত্যি ছোট্ট একটা মেয়ে নিয়ে হাজির। আমি তো প্রথমে ওকে দেখে অবাক। এতো ছোট্ট মেয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে না তো আবার?

আমার কথা শেষ না হতেই বুয়া বলতে লাগলো, না খালাম্মা কানবো না, একটু আদর-যত্ন পাইলেই সারা জনম আপনের কাছে থাইক্যা যাইবো। মা নাই। সৎ মাডা খুব জ্বালায়।

মা নেই কথাটা শুনেই মেয়েটার প্রতি কেমন যেন একটা মায়া চলে এলো সে মুহূর্তেই। কাছে ডাকলাম।

নাম জিজ্ঞাসা করতেই বললো, *আমার নাম কাদিজা*। ময়মনসিংহ বাড়ি।

খ–এর উচ্চারণ ক করে বললো।

আরো কাছে এনে বললাম, আমাদের ঘরে কোনো পিচ্চি নেই। তোকে আমি পিচ্চি বলেই ডাকবো।

সে মিষ্টি হেসে আমার কথায় সম্মতি দিল। তারপর থেকে তার নাম পিচ্চি হয়ে গেল।

অল্প দিনেই সে ঘরের সবার মন জয় করে ফেললো। কখন কে বাইরে যাবে, জুতা স্যানডাল এগিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে ঘরের টুকটাক কাজগুলো অল্প সময়ের মধ্যেই রপ্ত করে নিল।

আমাকে সঙ্গ দেয়া, আমার সঙ্গে গল্প করা ছিল তার প্রতিদিনের রুটিন। তাকে পেয়ে নিঃসঙ্গতা একেবারেই চলে গেল। একাকীত্ব আর আমাকে গ্রাস করতে পারে না। সারাক্ষণ কথা বলতো, হাসতো। সারা ঘরে ছিল তার অবাধ বিচরণ।

একদিন আমার খুব শরীর খারাপ। প্রেশারটা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। বিছানা থেকে উঠতে পারি না। ঘরের সবাই যার মতো কাজে বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ টের পেলাম পিচ্চি পাশে বসে তার ছোট্ট হাত দিয়ে মাথা টিপে দিচ্ছে। এমন আদর মাখা হাতে সে আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছে, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। ঘুম ভেঙে গেলে দেখি পিচ্চি জামা দিয়ে তার চোখ মুছছে।

কাদো কাদো গলায় বলছে, কালাম্মা তোমার অসুখ বালা অয় না কেন? তোমার কিছু অইলে আমি কই যামু?

পিচ্চি সব সময় আমাকে তুমি করে বলতো।

কালু (খালু) আইজ অফিস গেল কেন তুমারে তুইয়া। আইজ বাসায় আইলে একটা বহা দিমু।

এতোটুকু একটা মেয়ের আমার প্রতি মমতা আর ভালোবাসা দেখে বিস্ময়ে দুচোখে পানি চলে এলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে কেদেই ফেললাম। বললাম, তুই আমাকে ফেলে কোনোদিন চলে যাবি না তো?

কি যে কও কালাম্মা, তুমারে তুইয়া আমি কই যামু? তুমি কোনো চিন্তা কইরো না যেন, আমি তুমারে দেখবাম।

সত্যি সত্যি আমার প্রতি তার একটা আলাদা খেয়াল ছিল। দেড় বছর মেয়েটি আমার কাছে ছিল। এরই মধ্যে সে সবার হৃদয়ে একটা স্থান দখল করে নিয়েছিল। যেই বুকে তাকে আদর করে ঠাই দিয়েছিলাম সেই বুকটা আজ হাহাকার করছে। তার শূন্যতা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমাকে ক্ষত–বিক্ষত করে চলেছে। সারাক্ষণ তার মিষ্টি মুখটা আমার চোখে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি তার জন্য আজো অপেক্ষায় আছি। তার জন্য ভেবে ভেবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার এ অসুস্থতা দেখে সবাই আমাকে বলে, কাজের মেয়ের জন্য আবার এতো কি?

সে আমার কাছে কাজের মেয়ে ছিল না। দেড় বছরে তাকে কখন যে আমারই মেয়ে ভেবেছিলাম নিজেও জানি না। আমার এ অস্থিরতা দেখে সাহেব তার অফিসের পিয়ন পাঠিয়ে দিল পিচ্চিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। পরদিন একাই সে ফিরে এসে বললো তাদের এলাকারই এক প্রভাবশালী লোকের বাসায় তার সৎ মা তাকে দিয়ে দিয়েছে। এ কথা শোনার পর কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হলো আমি ভুল শুনেছি। পিচ্চি আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না।

পেপারে টিভিতে যখন দেখি গৃহকর্ত্রী দ্বারা কাজের মেয়ে নির্যাতনের শিকার তখন দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি তাকে আদর করে বুকে ঠাই দিয়েছিলাম, তাহলে আজ আমি কেন তাদের দ্বারা নির্যাতিত?

দেড় বছরে মেয়েটি আমাকে যে সুখ আর ভালোবাসা দিয়েছিল তা কোনদিন আমি ভুলবো না। আমি আরো অনেক দিন অপেক্ষায় থাকবো তার জন্য। তার সুখের জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া চাই, যেখানে থাকুক সে যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। আমার মতো মায়ের মমতা নিয়ে সে বড় হোক সারা জীবন তার জন্য এই কামনা থাকবে। আমার বুকভরা ভালোবাসা স্নেহ তার জন্য আজীবন থাকবে। আমার বিশ্বাস, বড় হয়ে যেদিন সে একা পথ চলতে পারবে সেদিন সে ছুটে আসবেই আমার কাছে। তার প্রতি আমার স্নেহের বন্ধন খুবই মজবুত ছিল। বিধাতা! তুমি আমার এ বিশ্বাসকে ভেঙে দিও না।

ভালোবাসা দিবসে আমার এক বুক ভালোবাসা, সমস্ত পৃথিবীর ভালোবাসা আমি পিচ্চির জন্য উৎসর্গ করলাম।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

সোনার চেইন

–মোহাম্মদ আহসান উল্যাহ

লেখাটিতে লেখকের বানান সংশোধন করা হয়নি।

–যাযাদি

জৌবনের আগুন দাউ দাউ করে জলছে। সারা শরীরে। জৌবন যেন উপচে পড়ছে। বর্ষাকালে পানি যেমন নদী নালা, খাল বিল বাড়ির আনাচে কানাচে টই টুম্বর থাকে। ঠিক সেই রকম জৌবনে টই টুম্বর।

এই যে শুনুন,

আমাকে বলছেন ভাবী।

এ্যা সাদের দেবর। আপনাকে বলছি।

কেন ভাবি। আমাকে দোকান থেকে শরিসার তৈল এনে দেন।

আমি দোকানে যাই আর ভাবি মেয়ে মানুষের শরীল এতো সুন্দর হয়? আমি কখন দেখি নেই। আমার লজ্জা করে কোন মেয়ের দিকে তাকালে। বরা বর কোন মেয়ের দিকে আমি কখনো তাকিয়ে দেখি নেই। পাছে যদি মেয়েরা বলে এই ছেলেটার সরম নেই। এই ভয়ে কোন দিন কোন মেয়েকে ভাল ভাবে দেখি নেই। আজকে ভাবির দিকে একটু ভাল করে তাকালাম মেয়ে মানুষ এতো সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না। আসলে ব্যাপারটা বুঝি না। ভাবি কি আমাকে ভালবাসে। আমার একটু দুর্বলতা আছে তার প্রতি। কিন্তু ভিষন ভয় লাগে কারণ এই ব্যাপারে কিছু বুঝি না, জানি না। জীবনে কোন মেয়ের সাথে মিশি নেই। বিয়ের পরে জামাই বউ ঘরের দড়জা বন্দ করে কি করে জানি না।

সেই দিন আমার বন্দু করিম বলল। বিয়ের পরে স্বামী স্ত্রী ঘরের দড়জা বন্দ করে প্রেমের খেলা খেলে। মধুর দেহ মিলন হয়। সেই দিন থেকে মেয়ের প্রতি আমার একটু লোব হয়।

জীবনে একবার দেখব কি সাধ। এইটা আমার আশা। ভাবি নেন আপনার তেলের বোতল।

ভাবি মুচকি হাসি দিয়ে বলে সাটের বোতাম খোলা কেন।

এই কথা বলে আমার সাটের উপরের বোতামটা লাগিয়ে দিলো। একবারে আমার কাছে এসে শরীলের সাথে শরীল মিশিয়ে দিলো। তার বুকের গরম সুগন্ধটা আমার নাকে এসে বাড়ি খেলো। তার সাদা ধুদ দুইটা আমার মুখের কাছে। আমি ইচ্ছা করলে খাইতে পারি এবং ধরতে পারি। কিন্তু আমার সাহস হলো না। আমার হাত, পা, থর, থর, করে কাপা শুরু হয়ে গেছে। আমার সারা দেহে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। আমার কথার সুর ভারি হয়ে গেছে। তার শরীল থেকে একটা গরম ভাব উঠছে। এবং তার শরীলের ছোঁওয়া আমার শীতল নদীতে প্রচন্ট ডেউ উঠেছে। ভাবি ব্যাপারটা বুঝতে পারছে।

আস্তে করে বলে আগামীকাল আমার বাড়িতে যাবে কেমন। আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকব। সকালে সকালে চলে যাবে কেমন। আমার বাড়িতে গেলে তোমাকে ভূমিকম্পের ঔষধ দিয়া দিমু। আম্মা ডাকতেছে আমি যাই এখন।

যাওয়ার সময় আমার গালে একটা টিম দিয়া গেলো। আবার বলে, আগামীকাল কথাটা যেন মনে থাকে। আমার তো রাত্রে ঘুম আসে না। আমি কি দেখলাম। কিসের গন্ধ পেলাম মানুষের না কি, হরীনের। মানুষের এতো সুন্দর ঘ্রান আগে জানা ছিল না। আপেলের মত তার দুধগুলো। মনে হয় যেন ঐ খানে কি আছে। ব্লাউজের ভিতর হিরা, রতন, মানিক সবই আছে। হাত দিলেই আমি সব পাব। কিন্তু আমি হাত দিব কেমন করে আগেই তো আমার ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। সুতারাং আগামীকাল তাহাদের বাড়িতে

যাইতে বলল তার কারন কি। আবার বলল ভূমিকম্পের ঔষদ দিবে। কি ঔষধ দিবে, জানি না। যাওয়ার সময় এও বলে গেল কেউ যেন না, জানে তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে কেমন। ভুল করিওনা লক্ষি দেবর আমার।

কি বিপদে পড়লাম। যাব, কি, না, বুঝে উঠতে পারছি না। না গেলে খারাপ দেখায় সেতো আমার জন্য অপেক্ষায় থাকবে। তাছাড়া যেই ভূমিকম্প উঠছে আমার না গেলে থামবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে। ভাল জামা কাপড় পড়ে রওনা হলাম। ঠিক বারটার মধ্যে তাহাদের বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখি। একটা ইজল গাছের নীচে দাড়িয়ে আছে। পরনে নীল শাড়ি আর ব্লাউজ খইরী কালার যেন মনে হয় আকাশ থেকে পরি নেমে আসছে।

আমাকে দেখে বলে আমি জানতাম তুমি আসবে।

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভিতর। বিশাল বড় বাড়ি গাছ–গাছড়ায় বাড়ি অন্ধকার। সে আমার হাত ধরে নিয়ে যায়। তার যৌবনের আগুনে আমার সারা দেহ ছেয়ে গেছে। আমি কাপা কাপা সুরে বলি ভাবি বাড়িতে কোন লোক জন দেখি না কারন কি।

সে বলল আমার খালাতো বোনের বিয়ে সবাই চলে গেছে। আর সেই জন্যই তো তোমাকে আসতে বলেছি।

আমি মনে মনে বলি তাহলে আজকে আমার খবর আছে। হিরা, মানিক, রতন, সবই আজকে আমাকে দেখাইয়া দিবে।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দড়জা লগিয়ে দিলো। আমাকে ঝড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। দুইজনে ঝাপ দিয়ে শুয়ে পরলাম খাটে। আমার আবার ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেলো।

সে আমাকে বলল ভয় নেই। ভূমিকম্পের ঔষধ দিচ্ছি আমি।

তার শাড়িটা খোলে ছোড়ে ফেলে দিলো খাটের এক কোনায়। ব্লাউজের বোতামগুলো ফটা ফট খোলে দিলো।

পেটিকোটের ফিতার ফটকটা টান দিয়া খোলে বলে শুরু করে দেও। আমার আগুন নিবিয়ে দেও ভাই। তোমার ভাই, তিন চার মাস পর পর বাড়িতে আসে আগুন নিবাতে পারে না।

তার উদামদেহ সম্পদ দেখে আমার মাথা ঠিক নেই। কি থুইয়ে কি করব দিশা পাই না। আমার বন্দুকটা লোহার মত শক্ত আর সোজা হয়ে গেছে। আমার পুরা দেহ কাপছে। আমি কোন দিন এমন দেখিনি। সেইঐ আমার পেন্ট সাট খোলে দিলো। এবং কায়দা করে তার উপরে আমাকে খাবের খাপ ফিট করে দিলো।

আমার বন্দুকটা দেখে বলে বাঃ মানুষটা ছোট জিনিসটা অনেক বড়।

আমার নাচ শুরু হয়ে গেলো। দুইজনের মধ্যে শ্বাস নিঃশ্বাস ঘন ঘন, আপ ডাউন করছে। আমার জীবনের এই প্রথম। তাই উপাসি চিতা বাঘের মত ঝাপায়ে পড়ছি।

ঘন্টা খানিক পরে আমার লিঙ্গ থেকে তার ভিতরে কি যেন গেলো তির তির করে। সে আমাকে চুম্মুকের মত আরো জোরে চাপ দিয়ে ধরে বলে আঃ ভাই তোকে কি করব। আমি বললাম কিছু করতে হবে না। আমার ভূমিকম্প শেষ। দুই ঘন্টা পর দুইজনের শরীল শীতল হয়ে গেলো। আমাকে ধরে আরামে শুয়ে আছে। ঘন্টা খানি পরে দুইজনে খাওয়াদাওয়া করলাম। এবং সন্ধ্যায় আমি বিদায় নিয়ে বাড়িতে আসলাম। বাড়িতে এসে দেখি আমার মামাতো ভাই বসে অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

কি ব্যাপার টমি তুই।

এ্যা আমি তোর জন্য বসে আছি। আগামীকাল বেলা তিনটায় তোর ফ্যালাইট।

কথা শুনে আমার পায়ের নিচে মাটি নেই। আজকে জীবনের প্রথম ভালোবাসার সুধা পান করলাম। অথচ আগামীকাল দেশ ছাড়তে হবে। এইটাই হলো ভাগ্যয়ের পরিহাস। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়া তাড়ি তাহাদের বাড়িতে গেলাম। আমাকে দেখে অবাক।

এতো সকালে কি ব্যাপার ভাবি বলল।

আমি বললাম আজকে আমার তিনটায় ফ্যালাইট।

আমার কথা শুনে তার মুখ মলিন হয়ে গেলো। তার পাশে ছোটবোন রেহানা কি একটা বলতে চাইছে। বলার আগেই ভাবি ধমক দিয়ে বলে চুপ কর এখন সে চলে যাছেছ। বলার দরকার নেই। যাও ভাই আমি প্রান ভরে দোওয়া করি যেখানেই থাক ভালো থাক।

বিদায় নিয়ে যখন চলে আশি দুই বনের চোখে জল।

কেটে গেলো সাত বৎসর আরব দেশে। আশার সময় তার জন্য একটা সোনার চেইন নিয়ে আসলাম। বাড়িতে আসার পর তার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো। এবং সময় সুযোগ মত বিকাল বেলায় কলের ঘাটায় দেখা হয়ে গেলো।

আমি বললাম কি রাধা কৃর্ষনার কথা মনে পরে।

এ্যা ভাই মনে পড়ে।

সোনার একটা চেইন এনেছি আপনার জন্য গলায় পরিয়ে দেই।

না আমি এই চেইন পরব না।

কেন। পড়বেন না কেন।

আমার চেয়ে বড় আর একজন লাইলী তোমার পথ পানে চেয়ে বসে আছে।

সে আবার কে।

আমার ছোট বোন তহমীনা।

এইটা আবার কি বললেন আপনি।

এ্যা সত্যিই বলছি। অন্ধ যেমন অন্যা জনের হাত ধরে রাস্তা পার হয়ে। ঠিক তেমনিই তোমার হাত ধরে বসে আছে। যেই দিন থেকে বুঝতে পারলাম রেহানা তোমাকে ভালবাসে। সেই দিন থেকে আমি তোমার কাছে থেকে দুরে সরে গেলাম। কারন আমার স্বামী আছে আর, ও যদি জানতে পারে আমি তোমাকে ভালবাসি তাহলে আমি আর তুমি ওর কাছে ছোট হয়ে যাব। সারা দিন রাত শুধু তোমার কথা বলে। তোমাকে অনেক অনেক ভালো বাসে। ভাই তোমার আর আমার মধ্যে যা হয়েছে আর যেন কেউ না জানে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাকে ও আমাকে ক্ষমা করে। তুমি আজই চলে যাও আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখ, আমার মত, তোমার লাইলি সেই ইজল গাছের নিচে বসে আছে।

আমি খুব তাড়া তাড়ি হেটে গেলাম। অনেক দুর থেকে দেখা যায় – ঠিক সেই ইজল গাছের নিচে দাড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে দৌড়হিয়া আমার কাছে আসতে লাগল। কিন্তু কাছে এসে থেমে গেলো। আমি পকেট থেকে সোনার চেইন তার গলায় পড়িয়ে দিলাম।

আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে আমি সোনার চেইন চাইনি। আমি তোমাকে চেয়েছি।

আমি বলালাম জানি।

দুই জনেই নিল আকাশে উড়ে গেলাম।

সিংগাপুর থেকে

কিস

–মোহাম্মদ ফুজেল আহমেদ

ভ্যালেনটাইনস ডে–কে উদযাপন করতে পারেন নানান প্রকারে, নানান ভাষায়। সেটা হতে পারে চুমুও। আসলে চুমু হচ্ছে সুস্থতার নিদর্শন, জীবনের জয়গান আর যৌবনের জোয়ার। ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসার মানুষটিকে সিক্ত কিংবা তপ্ত করে তুলুন চুমু বা চুম্বনের মাধ্যমে। পাঠকদের জন্য তেমনি কিছু চুম্বন টিপস :

ইনোসেন্ট কিস : ঠোট দুটো বন্ধ করে খুব সাদামাটাভাবে চুমু খেতে পারেন। সেটা সঙ্গী বা সঙ্গিনীর গালে, কপালে বা ঠোটেও হতে পারে।

হুইস্পার কিস : চুমু খাওয়ার আগে কিছু রোমান্টিক কথা বলুন। অতঃপর ঠোটে ঠোট মিলিয়ে চুমু খান। দেখবেন এমনিতেই চুমু খাওয়ার গতি ও অনুভূতি বেড়ে গিয়েছে।

ডিসট্রাকটিং কিস : সঙ্গী বা সঙ্গিনী যখন আপনার ওপর অভিমান করে থাকে, তখন প্রথমেই তার ঘাড়ে চুমু খান। এতে কাজ না হলে ঠোটে ক্রমাগত চুমু খান।

নেকেড কিস : আপনাকে উলঙ্গ হতে বলছি না। সঙ্গিনীর লিপস্টিক মুছে ফেলুন। এবার আপনার ঠোটের সঙ্গে সঙ্গিনীর ঠোটের স্পর্শ দিয়ে আসল স্বাদ অনুভব করুন। অতঃপর চুমু খান।

এ সাকার ফর অ্যানাদার : এটা একটু উত্তেজক চুমু। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ঠোটে ঠোট লাগিয়ে চুষতে থাকুন। সময় চলে যাবে কিন্তু টেরই পাবেন না। তবে বিরতির দরকার।

দি বাইট কিস : চুমু খাওয়ার সময় দাত দিয়ে হালকা কামড় খান। ঠোটে ঠোটে হওয়াটাই ভালো। তবে সাবধান, রক্তপাত যেন না ঘটে।

লেমন কিস : লেবুর রসের সঙ্গে হালকা চিনি মিশিয়ে রসটা ঠোটে লাগিয়ে নিন। এবার চুমু খেলে সময় অধিক স্থায়ী হবে।

দি কপিক্যাট কিস : আপনার সঙ্গীটি যেভাবে চুমু খায় ঠিক সেভাবে আপনিও চুমু খান। চুমু খাওয়ার সময় চোখ খোলা রাখুন।

আইস কিস : চুমু খাওয়ার আগে মুখে এক টুকরো বরফ রেখে মুখ ঠাণ্ডা করুন, অতঃপর বরফ ফেলে চুমু খাওয়া চালিয়ে যান। চুম্বন দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ইনক্লাইন্ড কিস : সঙ্গী বা সঙ্গিনীর মাথা ধরে নিচের দিকে ঝাকান। এরপর ওপর থেকে ক্রমাগত মুখে–ঠোটে চুমু খান।

কমব্যাট অফ দি টাংস কিস : সঙ্গী বা সঙ্গিনী একে অন্যের জিভ মুখের ভেতর পুরবেন। এভাবে পালাক্রমে চালিয়ে যান। দুজনেই আচ্ছন্ন হবেন স্বর্গীয় প্রশান্তিতে।

আর হ্যা, সে সঙ্গে জেনে নিন চুমুর বৈজ্ঞানিক নাম হলো ফিলেম্যাটোলজি। এক মিনিটের চুমুতে আপনি পোড়াচ্ছেন ২৬ ক্যালরি এবং আমরা সাধারণত জীবনের দুই সপ্তাহ সময় কাটাই চুমু খেয়ে। সত্যি কথা বলতে চুমু হচ্ছে ভাষাহীন ভালোবাসা, কখনো স্নেহের উচ্ছ্বাস, কখনো বা আশীর্বাদ।

সিলেট থেকে

শৌখিন লেখকরা

–ইলিয়াস খান তমাল

এসএসসি পাস করে প্রিয় শিক্ষককে সালাম সেরে উচ্চ শিক্ষার জন্য এলাম ঢাকা শহরে। এটা সেটা কতো কি নিলাম ব্যাগে ভরে আর প্রিয় শিক্ষকের কিছু উপদেশ নিয়ে এলাম মাথায় করে। স্যারের অন্যতম একটি উপদেশ হলো, ঢাকায় যাও কিংবা বিদেশে যাও, জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু কিছু জিনিস আছে যা চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে কিন্তু স্পর্শ করবে না।

ঢাকায় উঠলাম মামার ভাড়া বাসায়। কলেজে ভর্তি হলাম। এরপর ঢাকা শহরটা ঠিকমতো দেখার আগেই খুব দ্রুত দুটি বছর চলে গেল। অর্থাৎ এইচএসসি শেষ। দেখার মধ্যে দেখলাম গাড়িওয়ালা, বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়েদের অহংকার, অত্যাচার।

এরপর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে উঠলাম ফজলুল হক হলে। হলে অবস্থান করে দেখলাম স্বাধীনতা পেয়ে কিভাবে কিছু মেধাবী ছেলে বখে গেল। দেখলাম গ্রাম থেকে উঠে আসা কিছু ছেলের তখনো শরীরে শ্যাওলার গন্ধ অথচ মাথায় চকচকে মেধা। কিছু ছেলেমেয়ের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার হওয়া

দেখলাম, আবার চাকরির খোজে বড় ভাইদের জুতার তলা ক্ষয় হতেও দেখলাম। চোর, বাটপার, জুয়াড়িও দেখলাম।

এভাবে দেখতে দেখতে অনার্স মাস্টার্স শেষ করে কোনো এক বসন্তে কিছু স্বপ্ন মুঠোবন্দি করে, এলাম স্বদেশ ছেড়ে। আজ অনেক দিন পর আর এক বসন্ত। শীতের তীব্রতা নেই, বৃষ্টির রিমঝিমানি নেই, আছে ঝকঝকে রোদ। রোদে এই মন পোড়ে, দুই চোখ পোড়ে। পোড়া চোখে চেয়ে দেখি এই বসন্ত থেকে সেই বসন্ত। দূরত্ব বেড়েছে সব সখ্যে, সব সম্পর্কে। এমনকি আমার পিতা আমাকে তুই বলতেন, এখন তুমি বলেন!

দূরত্ব বাড়েনি বরং দিনে দিনে দূরত্ব কমেছে কেবল যায়যায়দিনের সঙ্গে। আর নতুন একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে যাযাদির কিছু শৌখিন লেখকের সঙ্গে। সম্পর্কটা আবেগের, ভালোবাসার, নাকি অন্যকিছুর তা বুঝি না। বুঝি শুধু যাযাদির প্রতিটি সংখ্যা হাতে পেয়েই আগে এদের লেখা খুজি, খুজতে হয়। এদের লেখা পেলে মনে যেমন আনন্দ হয়, না পেলে হতাশায় ভুগি। তাদের কয়েকজনের পরিচয় উল্লেখ করছি : জিয়া হাসান (মোহাম্মদপুর, ঢাকা), নাজনীন ইলিয়াস (পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা), জনি ইসলাম (মিরপুর, ঢাকা), জিদনী (ইতালি), রহমান মনি (জাপান), টিটন রহমান (ওয়ারি, ঢাকা), ফারহানাজ কান্তা (মুন্সীপাড়া, রংপুর), রানা জামান (চাদপুর), বীরাঙ্গনা (ইটালি), আলী হোসেন চৌধুরী (সিংগাপুর)।

আর যে লেখকের লেখাছাড়া কোনো বিশেষ সংখ্যা কল্পনাও করতে পারি না তিনি শুধু আমার নয়, যাযাদির সব নিয়মিত পাঠকের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি এএসএম আছাব আলী (জয়পুরহাট)। উল্লিখিত নামগুলো সবসময় আমার মাথায় ঘুরপাক খায়।

এইতো অল্প কিছুদিন আগের ঘটনা –

তিন-চার বন্ধু মিলে এটিএন বাংলার ইসলামী সওয়াল ও জওয়াব লাইভ অনুষ্ঠানটি দেখছিলাম। এক সময় উপস্থাপক আরকান উল্লাহ হারুনী তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, কে বলছিলেন, কোথে কে?

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এলো আমি নাজনীন ইলিয়াস, পূর্ব রাজাবাজার থেকে।

কি জানতে চাইলেন নাজনীন ইলিয়াস উত্তেজনায় তা আর শোনা হয়নি। আমি নাম শুনেই চিৎকার দিয়ে উঠলাম, নাজনীন ইলিয়াস, নাজনীন ইলিয়াস...। বন্ধুরা সবাই জানতে চাইলো উনি আমার কে হন। কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। কেবল যাযাদির কয়েকটি সংখ্যা এনে মেলব্যাগ পাতা থেকে তার কয়েকটি লেখা বের করে দেখালাম।

আজ এই বসন্তে, যারা নিয়মিত লিখছেন যাযাদিতে তাদের প্রতি শুভেচ্ছা। যারা ইদানীং লিখছেন না, তাদের আবারও লেখার অনুরোধ। আর সবার প্রতি রইলো অনেক অনেক ভালোবাসা।

জাপান থেকে
ektamal@hotmail.com

বিষ ও নারী

– মোহসীন ভূঞা

সিনডেরালা সিনেমা দেখতে গিয়ে তার কনিষ্ঠা আঙুলের স্পর্শে নিজেকে ক্ষণিক রাজকুমার মনে হলেও জীবনানন্দের কবিতার মতো স্বপ্নের রাজকুমারী ঘুম পথে এসে দিনের আলোয় মিলিয়ে যায়। মোহভঙ্গে অদ্ভুত খেয়াল চাপে মাথায়।

কারেন্ট চলে গেলে কিংবা অমাবস্যা রাতের নিকষ অন্ধকারে ধানমন্ডি লেকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হেটে যেতাম। দিনের বেলায় দেখেছি, ছোট গাছের ঝোপের পাশে রাগী যুবকরা বোতলে কালো পানীয় ও চানাচুর নিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকে। যত্ন করে লাগানো ফুলের বাগানের আড়াল নিয়ে যুগলেরা উদাস দৃষ্টিতে পানির দিকে তাকিয়ে থাকতো। ছিনতাইকারী ধরার বাহানায় পুলিশ লেকের পার্কে টহল দিতো

আর উত্যক্ত করার আইনি ভয় দেখিয়ে যুগলদের নিজেরাই উত্যক্ত করে পকেট ভারি করতো। পুলিশকে টিজ বা একপেশে ভালোবাসার উপদ্রব আর প্রেমের পার্থক্য বোঝাতে মন চাইতো, সাহস হয়নি।
হালকা শীতে নাম না জানা গাছের নিচে কালচে নীল আর শাদা বুটির সাপকে দেখেছি মাথা উচু করে রোদ পোহাতে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে যখন হেটে যেতাম এসব ভয় শিড়দাড়া বেয়ে মৃদু কাপুনি দিলেও কেন যেন মনে হতো, আমার ঠিক পেছনে হাতছোয়া দূরত্বে যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে অথচ যার মুখ কোনোদিন দেখিনি, এমন এক নারী অনুসরণ করে চলেছে।
ভিয়েনায় এসে সর্বত্র আলোর বদান্যতায় অন্ধকার রাত পাইনি। ছুটির দিনে ইন্টারসিটি ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতাম। এভাবে একাকী এমন বিষণ্ণতার সীমা পেরিয়ে অন্য রকম এক ভালোলাগার প্রান্তে পৌছে দিতো।
দেশে থাকার সময়, ভয় ও ভালোবাসার গভীরে যেতে চাওয়ার বিপরীতে দুটো জীবকে সমীহ করে নিরাপদ দূরত্বে থেকেছি কিংবা উল্টো পথ ধরেছি। অথচ কাকতালীয়ভাবে তারা সব সময় আমার পিছু নিয়েছে।
এক যাত্রায় ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষায় আছি ঠিক এ সময় হুড়মুড় করে একজন বহু সিট খালি থাকা সত্ত্বেও একেবারে আমার মুখোমুখি বসে। তার বেশভুষা ও গায়ের উৎকট গন্ধে বুঝে নিয়েছি বিধি বাম। অভদ্রতা হবে তাই নিজে উঠে যেতে পারছিলাম না। অন্যদিকে অস্বস্তিতে ঘেমে উঠছিলাম। পকেট হাতড়ে ঠোটে সিগারেট নেয়াতে খুশি হলাম, তার গন্তব্য দূরে নয়।
এখানে যানবাহনে ধূমপান নিষিদ্ধ। নেশাজীবীরা গন্তব্যের স্টেশনে পৌছানোর আগেই সিগারেট বের করে আগুন ধরানোর অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক শেষ স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে নামে।
তার সঙ্গে আলাপের শুরু জানালা বন্ধ করা নিয়ে। শেষটা হয়েছে অসম্ভব হৃদ্যতায়। বুঝেছি পাগল মানুষ বলতে কিছু নেই, আছে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। তার বাম হাতে নিকোলা নামের উল্কি দেখে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে একাধারে ব্যথিত ও বিমোহিত হয়েছি।
প্রেয়সীর সঙ্গে জোছনা রাত উপভোগ করার জন্য স্পিডবোট ভাড়া করে তারা। উদ্দেশ্য এক সপ্তাহ পানিতে বলাকা মন নিয়ে ভেসে যাওয়া। প্রথম দিন ডোনাও নদীর নির্জন প্রান্তে নোঙর করে। বাধভাঙা আনন্দে পানের মাত্রা একটু বেশি হয়ে যায়। রাতে আর্তচিৎকারে ঘুম ভাঙে তার। চারদিকে আগুন দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আগুন তার পিঠও গ্রাস করেছিল। তবুও চোখ যায় নিকোলার দিকে। অস্পষ্ট স্বরে করুণ মিনতিতে শুধু বলতে পেরেছে, আমাকে মেরে ফেল প্লিজ।
ভালোবাসার মানুষকে কষ্টের হাত থেকে বাচাতে অজান্তে গলার দিকে হাত বাড়ায়। হয়তো তার প্রয়োজনও ছিল না। তারপর কিছুই মনে নেই। হসপিটালের বেডে শুয়ে মনে হয়েছে, গলা টিপে না ধরলে নিকোলা তারই মতো হয়তো বেচে যেতো। এ আক্ষেপ বয়ে বেড়াতে হচ্ছে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে।
হাত বাড়িয়ে বিদায় নিতে গেলে বাম হাত এগিয়ে স্মিত হেসে বলে ডান হাতের সেই আংগুলগুলো নেই। আবারো কবিতা সত্যি হয়ে যায় – মানবকে নয়, নারী শুধু তোমাকে ভালোবেসে, বুঝেছি নিখিল বিষ কি রকম মধুর হতে পারে।

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া থেকে
mohsinbhuian@msn.com

মালায়ু মেয়ে

মনির–এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রবাসে বছরখানেক আগে। তারপর কেমন করে যেন বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এবং বর্তমানে প্রায় ছয় মাস ধরে আমরা দুইজনে রুমমেট হয়ে গেছি।

ওর নিজের ভাষায় ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত লেখাপড়ার রেসে সে শামিল ছিল। কথাবার্তায় আচার–আচরণে, চলাফেরায়, সবকিছু মিলে পুরোপুরি একজন উড়নচণ্ডি টাইপের ক্যারেক্টার। গত পাচ–ছয় মাস হলো কোনো কাজ করে না। সারা দিন বাসায় শুয়ে বসে অথবা ভবঘুরের মতো সারা দিন এখানে–সেখানে ঘুরে বেড়াবে। অনেকবার বলেছি একটা জব খুজে ঢুকে যেতে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। এখন আর বলি না।

বাসা ভাড়া এবং মেসের ব্যয়ভার আমাকেই বহন করতে হয়। মনিরকে ফেলতে পারি না। কারণ আমি যখন মোটরসাইকেলে অ্যাকসিডেন্ট করে বাসায় বন্দি তখন এই ছন্নছাড়াটাই আমাকে সেবাযত্ন করেছিল। তবে মেসের যে খরচটা তা অন্যভাবেও কিছু কিছু আসে। ভাবতেও অবাক লাগে এমন একটা আলসেকে ভালোবাসে বিশ বছর বয়সী একটা মালায়ু মেয়ে। এদেশের মূল অধিবাসীকে মালায়ু বা Malayu ডাকা হয়। ওই মেয়েটাই মাঝে মধ্যে বাজার করে এনে দিয়ে যায়। এতে আমার উপর একটু প্রেশার পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন দেখায় এজন্য আমি মনিরকে বলেছি, সে যেন আর বাজার না করে। মেয়েটার সঙ্গে আমার সম্পর্কও বেশ ফ্রেন্ডলি।

মেয়েটার পুরো নাম মারিয়ানা বিনতি ওমর। মারিয়ানা নামেই পরিচিত। স্বাস্থ্য ভালো। গোলগাল চেহারা। খুবই নম্র ও ভদ্র। কথাবার্তা খুব আস্তে ধীরে এবং সহজভাবে বলে। খুব চমৎকার ব্যবহার মারিয়ানার। সপ্তাহে দুই–তিন দিন বাসায় এসে মনিরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যায়। মনিরের পকেট খরচের টাকা দিয়ে যায়। উল্লেখ্য, মারিয়ানা একটা অফিসে ক্লার্ক পদে চাকরি করে। নিজস্ব একটা গাড়িও আছে।

মারিয়ানার সঙ্গে পরিচয় হয় মনিরের প্রায় তিন বছর আগে। যখন দু'জনেই একটা কোরিয়ান ইলেক্ট্রনিক্স কম্পানিতে জব করতো। তারপর পরিচয় মোড় নেয় ভালোবাসায়। তারা একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে জেনেছে। সে কথাও পুরনো হয়ে গেছে। কারণ তারা তার আগে থেকেই বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখে আসছে। ব্যাপারটা তাদের পরিবারেও জানাজানি হয়েছে। বিশেষত মনিরের পরিবারের সবাই জানে।

মনিরের গার্ডিয়ানরাও মনিরকে বলেন, যদি বিয়ে করতেই চাস তবে বিয়ে করে বৌ নিয়ে দেশে চলে আয়। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে। বাংলাদেশে মারিয়ানা যেতে চাইলেও ঠিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। কারণ এখানে এরা স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত। নিজের ব্যয়ভার নিজেই বহন করতে সমর্থ। মাসে হাজার–বারশ' রিংগিট স্যালারি কোনো ব্যাপার নয়। এছাড়াও সমস্যা হচ্ছে মনিরের নেই কোনো বৈধ কাগজপত্র। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা।

মাস দুয়েক আগে পারিবারিকভাবে আয়োজিত একটা বিয়ে মারিয়ানা নিজেই ভেঙে দিয়েছে।

আসলে ভালোবাসা ব্যাপারটাই মনে হয় কিছুটা এমন, যা সমতল নয় অসমতলভাবে চলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এ কারণেই হয়তো লোকে বলে ভালোবাসায় নেই কোনো উচু নিচু জাত বেজাত বা ধনী গরিব।

জয় হোক, মনির এবং মারিয়ানার ভালোবাসার।

নাম বিহীন, পোর্ট ক্লাং, মালয়শিয়া থেকে

মমি

–মোহাম্মদ নাসিমুল ইসলাম

বইয়ের পাতায় এবং টেলিভিশনের ডকুমেন্টারি মুভির বদৌলতে *মমি* শব্দটি আজ আর অপরিচিত নয়। শুষ্ক অবস্থায় পরিত্যক্ত জীবদেহের এক বিশেষ ধরনের অসহনীয় গন্ধহীন, অপচনশীল রূপান্তরকে মমি বলা হয়।

এক শীতের সকালে মমিতে রূপান্তরিত হওয়া এক মৃতদেহ নিয়ে আমার কাছে হাজির হলো জাপানিজ পুলিশ। উদ্দেশ্য ময়না তদন্ত।

দীর্ঘ কর্মজীবনে সেটি ছিল আমার দেখা দ্বিতীয় মমি। প্রথমটি দেখেছিলাম আমার তৎকালীন কর্ম ও শিক্ষাস্থল জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটি মেডিকাল স্কুলের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগীয় মিউজিয়ামে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেল, মৃত বাহাত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধা ছিলেন বড়ই নিঃসঙ্গ। একাকীত্বের যন্ত্রণা এড়াতে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন একাত্তর বছরের আরেক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাকে। সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে এক সঙ্গেই তারা থাকতেন। ঘুরতেন এক সঙ্গে, ঘুমাতেনও একই বিছানায়। বছরে একবার তারা পারিবারিক ওবন উৎসবে পালাক্রমে কোনোবার এর বাড়ি তো অন্যবার ওর বাড়ি জোড়া বেধে হাজির হতেন।

ওবন উৎসবে পরিবারের সকলের একত্রিত হওয়া জাপানিজ রীতি এবং এ উদ্দেশ্যেই জাপানিজরা এ উৎসব পালন করে থাকে। অনেকের মতো এতোটুকুই ছিল তাদের নিজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক। এতে করে তাদের উভয়েরই নিজ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। তবুও তারা ছিলেন সুখী এবং এভাবেই নয় দশটি বছর আনন্দের মাঝে কাটিয়ে দেন।

বৃদ্ধা ঘটনার দিন অসুস্থ থাকায় অন্যজন একাকী বাজারে গিয়েছিলেন। ফিরতে একটু দেরি হয় তার। এসে দেখেন অসুস্থ বান্ধবীটি মারা গেছেন।

সঙ্গীহীন হয়ে যাওয়ার আশংকায় দুঃসংবাদটি চেপে যান তিনি। সেবা-যত্ন চালিয়ে যান মৃত বান্ধবীর। এতে করে তাদের এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি বন্ধ হলেও এক বিছানাতেই তারা ঘুমাতেন। লাশটিতে পচন ধরলে পরিচর্যা বাড়িয়ে সুগন্ধী স্প্রে শুরু করেন।

এভাবেই উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে লাশটি এক সময় মমিতে রূপান্তরিত হয়। দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় সহজাত প্রক্রিয়ায়।

জানতে চাইলাম, ঘটনা পুলিশ জানলো কিভাবে?

ওবন উৎসবে সে বছর হাজির হয়েছিলেন একজন। সকলেই তখন জানতে চান অন্য বান্ধবীর কথা। এক পর্যায়ে সত্য প্রকাশ করেন জীবিতজন। পুলিশকে সেখান থেকেই টেলিফোনে জানানো হয় পুরো ঘটনা। পুলিশ মমি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের উদ্দেশ্যে মর্গে নিয়ে আসে।

প্রাথমিক দর্শনেই লক্ষ্য করি, মমিটি নতুন কাপড়ে মোড়ানো আর নতুন কম্বলে জড়ানো। সেবা-যত্নে পরিচ্ছন্ন মুখটি অবিকল জীবিত অবয়বে সংরক্ষিত। জীবিত বান্ধবীটি সেদিনই হন্তদন্ত হয়ে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন।

প্রশ্নের জবাবে জানালেন, একাকীত্ব বড় কষ্টের। ভালোবাসারও ভাষা আছে। সে ভাষার বহিঃপ্রকাশ একেক বয়সে একেক রকম। একটা সময় থাকে যখন হাত ধরাতেই মহা সুখ পাওয়া যায়। তারপর এক সময় আসে যখন দৈহিক মিলনেও মন ভরে না। এখন তার ওসবের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি চান তার একাকীত্বকে ভুলে থাকবেন, বান্ধবীর পাশাপাশি আমৃত্যু ঘুমাতে।

তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, তার বান্ধবীকে যেন ময়না তদন্ত শেষে তার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয়। ময়না তদন্তে মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক পাওয়া গেলেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মমিটি সৎকারের নির্দেশ আমাকেই দিতে হয়েছিল।

মালয়শিয়া থেকে
islammn@yahoo.com

ছলনা

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি। চার ভাই বোনের মধ্যে আমি মেজো। বাবা সরকারি চাকরি করেন। খুব সৎ মানুষ। দাদা আমাদের এ বাড়িটা দিয়েছিলেন বলে রক্ষা। নয়তো ঢাকার মতো জায়গায় এতো অল্প বেতনে বাড়ি ভাড়া করে থেকে ছয় জন মানুষের খরচ চালানো বাবার পক্ষে সম্ভব হতো না। বাবা মা আমাদের কষ্ট করে মানুষ করছেন। তাই আমাদের চার ভাই বোনের ইচ্ছা লেখাপড়াটা ভালো মতো শিখে সংসারের অভাব দূর করা। বাবা মাকে একটু শান্তি দেয়া।

বড় ভাই লেখাপড়ার পাশাপাশি কয়েকটা টিউশনি করে। আমিও দুটো টিউশনি করতাম। যখন জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক তখনই আমার জীবনে হঠাৎ করে সেই মানুষটির আগমন ঘটে। আমার এক ছাত্রীর ছোট চাচা। অস্ট্রেলিয়া থাকে। দেশে বেড়াতে এসেছে। আমার ছাত্রী একদিন তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এরপর থেকে মাঝে মধ্যে পড়ানো শেষ করে চলে আসার সময় সে আমার সঙ্গে কথা বলতো। প্রথম দিকে সংকোচ বোধ করতাম। সে তার অমায়িক ব্যবহার দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে সব সংকোচ দূর করে দিল।

তার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগতো। মনে হতো কোনো আপন মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। সে খুব সুন্দর করে কথা বলতো। তার সঙ্গে আমার পরিবারের কথা, নিজের কথা শেয়ার করতাম। মনে মনে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। শত কষ্টের মাঝেও সে ছিল সুখের ছোয়া।

সে প্রায়ই আমাকে বাইরে দেখা করতে বলতো। রাজি হতাম না। কিন্তু একদিন তার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। প্রথমে ফাস্টফুডের দোকানে বসার কথা থাকলেও কেউ দেখে ফেলতে পারে বলে সে অনেকটা জোর করে তার এক বন্ধুর বাসায় নিয়ে গেল। তাকে বিশ্বাস করতাম বলে এটা যে তার চালাকি তা বুঝিনি। সেখানে গিয়ে দেখলাম সে ছাড়া বাসায় আর কেউ নেই। কিছুক্ষণ পরে তার বন্ধুটিও বাইরে চলে গেল। আমরা গল্প করছি। সে কিছুক্ষণ পরপর আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। ওড়না ফেলে দিচ্ছে। এক পর্যায়ে চলে আসতে চাইলে সে জানায় আমাকে ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি কি না জানতে চায়। আমার মনের কথা জানালে সে বলে, দুজন যখন দুজনকে ভালোবাসি তখন শারীরিক সম্পর্ক হলে অসুবিধা কোথায়। এই বলে সে আমাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যেতে চায়।

আমি বাধা দিই এবং সেখান থেকে চলে আসতে চাইলে সে জোর করতে শুরু করে। পুরো শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করি। এক পর্যায়ে সে আমার গালে চড় বসিয়ে দেয়। আমি হতবাক হয়ে যাই। সে আমাকে বলে ভালোবাসে না। সে আমাকে আরো বলে, যদি তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করি তাহলে সে প্রতিবারের জন্য আমাকে মোটা টাকা দেবে যা দিয়ে আমার সংসারের অভাব দূর হবে। সে চাইলে অন্য মেয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি করতে পারতো কিন্তু তার নতুন মেয়ের দরকার। একেবারে নতুন। তাই আমাকে পছন্দ করেছে। বাইরে আনার জন্য এতোদিন আমার সঙ্গে অভিনয় করেছে।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। টেবিলে একটা ফুলদানি দেখতে পেয়ে সেটা দিয়ে তার ঘাড়ে জোরে আঘাত করে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। সেদিন ভালোবাসার ওপর যে ঘৃণা জন্মেছিল তা আজো দূর হয়নি। আর দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিনটা ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। ভালোবাসা দিবস।

নাম ঠিকানা বিহীন, ঢাকা থেকে

দুই বোন

–মোহাম্মদ রাসেল মিয়া

২০০০ সালে সউদি আরব এসেছি। এখানে ফ্র ভিসায় কাজ করি। অনেক জায়গায় কাজ করেছি। এখন এক সউদির বাসায় কাজ করছি। আমার কাজ হলো বাড়ি দেখেশুনে রাখা। আমার মালিক সপ্তাহে এক দুই দিন আসেন বাড়িতে, আবার চলে যান। আমার রুম হলো গেটের সঙ্গে। সারা দিন বসে থাকি। কেউ এলে তাকে বলি মালিক বাড়িতে নেই, অমুক দিন এলে পাবেন।

এই হলো আমার কাজ।

আমি যে বাসায় কাজ করি ঠিক তার সামনের বাসায় দুটি মেয়ে কাজ করে। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা তারা বাইরে আসে ময়লা ফেলার জন্য। আমাকে যখনি দেখে, হাসাহাসি করে আর কি যে বলে তার কিছুই বুঝি না।

এভাবে এক মাস গেল। কিছুদিন পর যখন ময়লা ফেলার জন্য এলো, আমাকে লক্ষ করে একটি চিঠি ফেলে গেল।

কিছুক্ষণ পর চিঠিটা আনলাম এবং পড়লাম।

চিঠিটি ছিল ইংরেজিতে। অনুবাদ এ রকম –

আমার নাম নূর। আমাদের দেশ ইন্দোনেশিয়া। আমি এখানে বাড়িতে কাজ করি। আমার বয়স বাইশ। আমি তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন থেকেই ভালোবেসে ফেলেছি। তোমার উত্তর কি?

আরো অনেক কিছু।

তার চিঠির উত্তর দিলাম, আমারও একই অবস্থা। চিঠিতে আমার মোবাইল নাম্বার দিলাম।

দুই দিন পর আমার কাছে ফোন করলো। জিজ্ঞাসা করলো কেমন আছি? আমি তার বাসায় যাবো কি না?

বললাম, কিভাবে আসবো? তোমার মালিক যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে আমাকে পুলিশে দিয়ে দেবে।

বললো, বাড়িতে যখন কেউ থাকবে না তখন আমি তোমাকে ফোন করবো। তখন আসবে।

বললাম, ঠিক আছে।

আরো অনেক কথা হলো।

আমাদের কথা হতো আরবিতে।

পরের দিন আবার যখন ফোন এলো তখন একই নাম্বার দেখে রিসিভ করলাম।

কে? নূর?

ওপাশ থেকে বললো, আমি নূরের বোন। আমার নাম মরিয়ম।

বললাম, কেমন আছিস?

সে বললো, ভালো।

আজ বাড়িতে কেউ নেই। তুমি ঠিক রাত এগারোটার সময় গেটের সামনে আসবে। সেখানে নূর তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।

ঠিক আছে। আমি আসবো।

রাত এগারোটার সময় গেলাম। দেখি ঠিকই আমার জন্য নূর অপেক্ষা করছে।

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেইন গেট বন্ধ করে দিল এবং আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

যাওয়ার পর আমার সারা শরীর কাপছিল। কি করবো বুঝতে পারছি না।

সে বললো, তুমি এমন ভয় পাচ্ছ কেন?

যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে তাহলে কি হবে? উত্তর দিলাম।
দেখলে দেখবে। এতো ভয় যদি তাহলে আসার কি দরকার ছিল?
তারপর বুকে সাহস নিয়ে তাকে প্রথম স্পর্শ করলাম।
সেও আমাকে পাগলের মতো তার বুকে টেনে নিল।

তারপর যা হবার তা হলো।
এভাবে চললো এক মাস। এক মাসে চার দিন গেলাম।
কিছুদিন পর আবার তার বোন মরিয়ম আমার কাছে ফোন করে বললো, তুমি কি আমার কাছে আসবে?
বললাম, আমি যদি তোমার কাছে আসি তাহলে তোমার বোন আমার ওপর রাগ করবে।
আমার বোনকে আমি বা তুমি কিছু না বললে সে কিছুই জানতে পারবে না।
বোন বলতে নূর এবং মরিয়ম দুজনই ছিল ইন্দোনেশিয়ান। সে হিসেবে নূরকে সে বোন বলতো আর দুজন কাজও করতো একই বাড়িতে।
সে বললো, তুমি এসো।
ঠিক আছে। আসবো বলে ফোন রাখলাম।
ঠিক সেই সময় নূর আমার কাছে ফোন করে বললো, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসো কি না তা পরীক্ষা করার জন্য মরিয়মকে দিয়ে তোমার কাছে ফোন করালাম। দেখি তুমি কি রকম মানুষ। তুমি কি না তাকে বললে, তার কাছেও আসবে। আজকের পর থেকে আমার কাছে আর ফোন করবে না।
বললাম, আমার কথা শোনো। তার পর যা বলার বলো।
তোমার কোনো কথাই শুনবো না বলে সে ফোন রেখে দিল।
তারপর থেকে আমি যতোবার ফোন করি সে মোবাইলে আমার নাম্বার দেখলে রিসিভ করে না আর সেও আমার কাছে ফোন করে না। আমি কি করবো? বাংলাদেশ না যে, নূরের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলবো, আমার ভুল হয়ে গেছে আর এ রকম হবে না।
হয়তো বা সে আবার একদিন ফোন করবে। বলবে, আজ বাড়িতে কেউ নেই, চলে এসো। সেই আশায় বসে আছি। হয়তোবা কালও সেই ফোন আসতে পারে...।

সউদি আরব থেকে

এসএমএস

–এম আলম

মোবাইল আমার জীবনকে এমনভাবে বদলে দেবে কল্পনাই করিনি।
২০০০ সালে ব্যবসার প্রয়োজনে প্রথম মোবাইল নিই। শুরু থেকেই এসএমএস করা ছিল আমার কাছে দারুণ একটা ব্যাপার। পরিচিত, অপরিচিত বন্ধুদের এসএমএস পাঠানো আমার শখের নেশায় পরিণত হলো একদিন।
আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো এসএমএস বন্ধুর সংখ্যা। সেটা শুধু ছেলে বন্ধুতে সীমাবদ্ধ রইলো না। স্নিগ্ধা, কণা, মিলি, রাত্রি, আয়েশা, মেহেরিন, জেরিনসহ আরো অসংখ্য মেয়ে বন্ধু। যাদের সঙ্গে আদৌ আমার কোনো পূর্ব পরিচয় ছিল না, যাদের আমি কখনো দেখিনি। পরিচয়ের ঘটনা ও নাম্বারের ভিন্নতার কারণে অনেক বন্ধু আখ্যায়িত হয়েছে অনেক বিচিত্র নামে। যেমন পেইন, নটি বয়, ধড়ম, কুইক ইত্যাদি।
কিছুদিন যাবত খেয়াল করলাম আমার এসএমএস এখন বহুমুখী পথ পরিহার করে শুধু মেহেরিন কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। ফলে অন্য বন্ধুরা প্রায়ই এসএমএস-এ এই অভিযোগ করে এবং এসএমএস-এর অ্যানসার

দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করে। কিন্তু কোনো অনুরোধই আমাকে মেহেরিনমুখী থেকে অন্যমুখী করতে পারলো না।

মেহেরিন মেয়েটা এতো সুন্দর এসএমএস লিখতো, এসএমএসগুলো আমি বার বার পড়তাম। এমন কি তার পাঠানো এসএমএস অন্য বন্ধুদের কাছেও পাঠিয়েছি। ভাবতাম যার এসএমএস এতো সুন্দর হতে পারে, না জানি সে কতো সুন্দর।

মেহেরিনও আমার এসএমএস-এর প্রশংসা করতো।

এতো কিছুর পরেও এসএমএস-এ সীমাবদ্ধ রইলাম। কোনোদিন সরাসরি কল করিনি।

আস্তে আস্তে মেহেরিনের সঙ্গে সম্পর্কটা এসএমএস-এর মাধ্যমে গাঢ় বন্ধুত্বে রূপ নিল। মনে যা চাইতাম তাই হলো। একদিন রাতে খাওয়ার পর শুতে যাবো এমন সময় দেখি মোবাইল স্ক্রিনে মেহেরিনের সরাসরি কল। অনুভব করলাম আমার রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রিসিভ করে হ্যালো বলতেই ওপার থেকে মিষ্টি আর সুরেলা কণ্ঠের ঝংকার তুলে মেহেরিন বললো, এই যে কবি কেমন আছেন?

বললাম, কবি হলাম কখন?

সেদিন আট মিনিটের কথায় জানতে পারলাম মেহেরিনের ফোন বুকে আমার নাম্বারটি কবি নামেই সেভ করেছিল। আমার এসএমএস-এ নাকি কবিত্বের ছোয়া পেতো সে।

দিন যায় রাত আসে। মেহেরিনের সঙ্গে আমার কথা আর নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে বাধা ছিল না। যখনই মন চায় কল করি এই প্রিয় মানুষটাকে। এই মোবাইলের মাধ্যমে আমরা একে অপরের এতো আপন হয়েছি যে দুজনের যতো মনের কথা কোনোটাই আর অজানা ছিল না। এমন কি যতো গোপন কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতাম একে অপরকে।

মাঝে মাঝে মেহেরিনকে দেখার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা হতো। ভাবতাম আমরা একে অপরের কতো আপন অথচ কেউ কাউকে এখনো দেখিনি। এ কথা একদিন মেহেরিনকে বলতেই মেহেরিন জেদ ধরলো, সেদিনই দেখা করবে।

বললাম, সামনের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে আমরা দেখা করবো।

সে কিছুতেই মানলো না। তার জেদের কারণে সেদিনই ফয়স লেকে স্থান নির্ধারিত হলো বিকাল তিনটায়। দুরু দুরু বুক নিয়ে বের হলাম ঘর থেকে। জ্যামের কারণে আমার একটু লেইট হলো। মেহেরিন দুই বার মিসকল দিয়ে ইতিমধ্যে তার উপস্থিতি জানান দিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে টিকেট কেটে কল দিলাম মেহেরিনকে। বললো, চত্বর পেরিয়ে লেকের বামপাশে একটা বেঞ্চিতে তাকে দেখতে পাবো।

রক্তের দ্রুত সঞ্চালনের কারণে মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠলো। জানি না এতোদিনের মোবাইলে কথা বলা মেহেরিন আর আজকের মেহেরিন কেমন হয়। এসএমএস-এর মেহেরিন বাস্তবে আমাকে কিভাবে গ্রহণ করে? সবচেয়ে বেশি ভয় লাগছিল এ জন্য যে, কোনোদিন কোনো অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে একাকি এই প্রথম দেখা।

চত্বরটা পেরিয়ে লেকের বাম পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মেহেরিনকে আবারও কল দিলাম।

কিন্তু একি!

বেঞ্চিতে বসা যে মেয়েটি আমার কলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করলো তাকে দেখে রীতিমতো চমকে গেলাম। সে আর কেউ নয়, আমার মামাতো বোন আরজু।

আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আড়াল থেকেই কথা বললাম, কে মেহেরিন?

আমার কথার উত্তরে আরজুই বললো, হ্যা, তুমি কোথায়?

মোবাইল বন্ধ করে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে বললাম, আরজু তুমি! তুমিই আমার সঙ্গে মেহেরিন সেজেছো? কেন এমন করলে!

জবাবে মেহেরিন যা বললো তা কল্পনা করিনি। কারণ সে আমার থেকে অনেক ছোট। সে নাকি আমাকে ভালোবাসে। আমাকেই বিয়ে করবে। অথচ নানার সম্পত্তির ভাগে অনিয়মের কারণে আমার মা অনেকদিন ধরে তার বাবার নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না। যার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে আরজুদের বাড়িতে আমাদের যাওয়া আসা নেই।

তখন আরজু সবেমাত্র ক্লাস ফোরে।

আজ সেই আরজু নাম্বার যোগাড় করে আমারই সঙ্গে খেললো এসএমএস খেলা। আমাকে নীরব দেখে আরজু জিজ্ঞাসা করলো, কি রাগ করেছো?

হঠাৎ সে হাত দুটো ধরে খুব মায়াবী সুরে বললো, নাম ঠিকানা মিথ্যা বলে তোমাকে এতোটা দিন ঠকিয়েছি। মাফ করে দাও। তুমি তো নাম ঠিকানা মিথ্যা বলোনি। আসলে আমার কোনো উপায় ছিল না। সত্য বললে তুমি চিনে ফেলবে। তাই মিথ্যা বলেছি।

এক পর্যায়ে সে কেদে দিল।

তার আকুতিতে আর স্থির থাকতে পারলাম না। নিজেই চোখের পানি মুছে দিয়ে বুকে টেনে নিলাম। সেই থেকে আরজু আমার জান।

পূর্ব বাকলিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

অনৈতিক

–আবু তালহা

বছর দেড়েক আগের কথা। নতুন অফিসে বদলি হয়েছি মাস খানেক হলো। সরকারি অফিসের মাঝারি ধরনের কর্মকর্তা আমি। এ অফিসে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছাড়াও কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা আছে। এরা *ফ্র সার্ভিস* নামে পরিচিত। অফিসের লোকজনদের এবং ক্লায়েন্টদের সাহায্য করে। কিছু বখশিশ পায়।

বছর বত্রিশ তেত্রিশ হবে বয়স। এদেরই একজন একদিন ক্লায়েন্টসহ আমার রুমে এলো। সেই প্রথম দেখা। কাজ শেষ করে চলে গেল। প্রথম দর্শনেই মনে হলো মোটামুটি সুন্দরী, একহারা দেহ।

কয়েকদিন পর অবসরে জিজ্ঞাসা করলাম, নাম কি?

জাহানারা। এখানে পনেরো বছর হলো কাজ করি। আমার স্বামী কামাল আগে এ অফিসের এমএলএসএস ছিল। দুই বছর হলো অন্য ব্রাঞ্চে বদলি হয়েছে।

মাঝে মধ্যে সে আমার রুমে আসে লোকজনসহ। টুকটাক কথা হয়। অফিসের কাছেই ভাড়া থাকে। একটি বাচ্চা। স্কুলে যায়।

আমার স্ত্রী ঢাকার কাছের জেলার সরকারি চাকুরে। দুই সন্তান আমাদের। বৌ বাচ্চাসহ ওখানে থাকে। আমি মাসে দুই তিনবার যাতায়াত করি। ঢাকাতে মেসে থাকি।

যাহোক, দিন যায়। জাহানারার প্রতি হালকা আকর্ষণ বাড়তে থাকে। দৈহিক আকর্ষণ। স্ত্রী থেকে দূরে থাকি। তাই হয়তো এ নেশা। জাহানারা বোঝে কি না জানি না।

একদিন জানালাম, জাহানারা, তোমার বাসায় যাবো।

সে বললো, একা বাসা চিনে যেতে পারবেন না। তাছাড়া বাসায় দিনে কেউ থাকে না। সকালে কামাল বাচ্চাকে নিয়ে চলে যায়। স্কুলে পৌছে দিয়ে সে অফিসে যায়। বিকেলে স্কুল থেকে বাচ্চাকে নিয়ে একত্রে ফেরে। আমি দুপুরে বাসাতে ফিরে রান্না-বান্না করে তাদের অপেক্ষায় থাকি। আপনি স্যার একদিন সময় করে একটু আগে অফিস থেকে বের হবেন। তাহলে কেউ খেয়াল করবে না, আমাকে অনুসরণ করে বাসায় চলে আসবেন।

প্ল্যানমাফিক একদিন তার বাসায় পৌছালাম। নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার। জাহানারা যত্ন করে শরবত আর ফলমূল খেতে দিল। গল্প-গুজব করতে করতে দুজনেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। আমার আদিম প্রবৃত্তি দৈহিক লালসায় লকলকিয়ে উঠলো। জাহানারা আমাকে অবাক করে দিয়ে সাড়া দিল। ঠোঁট, বুক, দেহ যৌন তৃপ্তিতে পরিশ্রান্ত হলো। সংবিৎ ফিরে এলে উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘরে ফিরলাম। এ অসম সম্পর্ক আমাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পোড়াতে লাগলো।

একদিকে জাহানারার দৈহিক আকর্ষণ, অন্যদিকে আমার স্ত্রী-পুত্র। পুরুষের কুরিপু বিজয়ী হয় বেশি। আমি পরাজিত হলাম। সময় সুযোগ করে সবার অলক্ষ্যে আমাদের মিলন চলতে লাগলো। স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্ক সুচারুভাবে বজায় রেখে চলছি।

একদিন জাহানারাকে বললাম, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলে কেন?

প্রকাশ করলাম না যে, তার দেহকেই আমি চাই, মন নয়।

সে বলা শুরু করলো।

তারা দুই বোন। মনোয়ারা বড়, জাহানারা ছোট। তিন ভাই। বাবা আদমজীর কর্মচারী। ভাইয়েরা বড়। দেখতে শুনতে ভালো বলে মনোয়ারার বিয়ে হয়ে গেল ক্লাস ফাইভে থাকতেই। আমি একা হয়ে গেলাম। সেভেনে পড়ার সময় মনোয়ারা মারা গেল সন্তান প্রসব করতে গিয়ে। সন্তান মানুষ করার জন্য দুলাভাই আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজি হলাম না। মা আর ভাইয়েরাও না করে দিলেন। আব্বা নাতির কথা চিন্তা করে নিমরাজি। স্কুল থেকে ফেরার পথে দুলাভাই একদিন ফুসলিয়ে তাদের বাড়িতে আমাকে আটকে দিল। খবর পেয়ে বহু দেনদরবার করে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। মা আমাকে বড় ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকাতে। ভাই-ভাবীর সংসারে থাকতে লাগলাম। তাদের তখনো সন্তান হয়নি। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল।

পাশের বাসার উঠতি যুবক কামাল আমাকে দেখে মুগ্ধ। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে ভাবীকে ম্যানেজ করে আমাকে উতলা করে তুললো। কামাল আমার তিন বছরের বড়। পুরুষালি দেহ। দেহ মনে নেশা জাগে তার সঙ্গে কথা বললে। আমিও উতলা তার জন্য। ভাগ্যগুণে ওই সময়ই কামাল এ অফিসে চাকরি পেয়ে গেল বড় সাহেবের বদান্যতায়। তার বাবা-মায়ের অমতেই আমাকে বিয়ে করে চিরদিনের জন্য আপন করে নিল।

জাহানারা থামলো। আমাকে দেখতে লাগলো। বুঝতে পারছি এর পরের অংশে স্বপ্ন ভাঙার সংকেত।

তখন দুজনের সংসার। খাওয়া, গোসল, ঘুমানো। শুধু সুখ আর ভালোবাসা। দুই বছর পর আমার কোল জুড়ে এলো আমার সাত রাজার ধন পুত্র। সংসারে বাড়তি খরচ যোগ হলো। বিয়োগ হলো কামালের সেই পাগল করা ভালোবাসা। তার মন যেন আমার কাছে থাকতে চায় না। ছেলে একটু বড় হলে আমিও তার অফিসে টুকটাক ফাই-ফরমায়েশ খাটতে লাগলাম। এতে আমার লাভ হলো, সময় কেটে যেতো। দুজনে কাছাকাছি থাকার সুযোগও হতো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, তার নজর এখন অন্য মেয়েদের দিকে। তার নাকি ক্ষিধে মেটে না আমার শরীরে। তার নজর প্রতিবেশী ঝর্নার দিকে। ঝর্না সদ্য স্বামী পরিত্যক্তা। একদিন কামাল বললো, ঝর্নাকে আমার চাই। তুই ব্যবস্থা কর। নইলে আমি থাকুম না। তোরে রাইখা চইলা যামু।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এ সেই কামাল! ছেলেকে বুকে নিয়ে কান্না থামাতে চাইলাম, পারলাম না। বুক ভাসলো। নারী অনেক কিছু ছাড় দিতে পারে। কিন্তু নিজের বিছানায় অন্য নারীকে শুতে দিতে পারে না। এ বিপদে কার কাছে সাহায্য চাইবো। এ কি বলার মতো কথা!

নিজের ভাগ্যের ওপর দোষ দিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ঝর্নাকে রাজি করালাম। তারা আমার বিছানায় সুখ কুড়ালো আর আমি ছেলেকে নিয়ে পাশের রুমে বুক ভাসালাম।

জাহানারার গলা ধরে আসে। তার ভেজা ঠোঁটে চুমু দিই। স্তনে আদর দিই।

আবেগে-আবেশে আমাকে জড়িয়ে ধরে। দেহের সঙ্গে পিষ্ট করতে চায়। আবার ঝড় ওঠে। ঝড় থামে।

জাহানারা শেষ করে। এখন কামালের দৃষ্টি পড়েছে আমার স্বল্প আয়ে। বাধা দিই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে। সে গায়ে হাত তোলে। মুখ বুজে সহ্য করি। কিন্তু আমার বিছানায় আর কাউকে আনতে দিই না। ওসব এখন বাইরে সেরে এসো। কিছু সময় কামাল আমার কাছে ফিরে আসে সেই পনেরো বছর আগের কামাল হয়ে। আমি সব ভুলে যাই।

কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরি হয় না। তার হাত খালি। তাই আমার ভালোবাসা দিয়ে তার হাত ভরতে চায়। ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার আদরে তাই আবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই।

জাহানারা আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছে। সে দেহ মনে আমাকে চায়। কিন্তু আমি তো চাই শুধুই ওর দেহ-যৌবন। আমার স্ত্রী-পুত্র ছাড়তে পারবো না। জাহানারা তাদের কথা জানে। তাদের প্রতি তার কোনো বিরাগ নেই।

দেড় বছর সকলকে ফাকি দিয়ে এভাবে দুজনের সম্পর্ক এগিয়ে চলছে। এ সম্পর্ক অসামাজিক, অনৈতিক। কিন্তু মনে হচ্ছে দেহ থেকে এ সম্পর্ক আমার মনেও শেকড় গাড়তে শুরু করেছে।

কামালের সঙ্গে কথা হয়। কিছু বলি না। তার ভালোবাসা বিহীন সম্পর্ক জাহানারাকে আমার কাছে সমর্পণ করেছে।

সমাজের এ রূপের সঙ্গে অনেকের হয়তো পরিচয় নেই, যেমনটি ছিল না আমারও। অদূর ভবিষ্যতে আমার বদলি। তখন এ সম্পর্ক কেমন হবে তাও জানি না। আমার অনুপস্থিতি কি আমার স্ত্রীকেও এমন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে? নিয়তি কাউকে ক্ষমা করতে চায় না। আমি কি শুধুই নিয়তির খেলার পাত্র!

ঠিকানা বিহীন

পরিসংখ্যান

–এ.পি.এস.এম.এস

এক. বিবাহিত ছাত্রছাত্রী (অধিকাংশ মাস্টার্সে পড়ুয়া) শতকরা সাতচল্লিশ ভাগ যার মধ্যে শতকরা চল্লিশ ভাগই ছাত্রী।

দুই. প্রেম করে বিয়ে করেছে (বিবাহিতদের মাঝে) এমন সফল এবং ভাগ্যবান প্রেমিক শতকরা আশি ভাগ এবং ভাগ্যবতী প্রেমিকা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।

তিন. বিবাহিত/বিবাহিতাদের মাঝে সন্তানের মা শতকরা ষাট ভাগ এবং সন্তানের বাবা শতকরা দশ ভাগ।

চার. ক্লাসমেটের সঙ্গে প্রেম করে এমন প্রেমিক যুগল (প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে) শতকরা পচিশ ভাগ।

পাচ. ক্লাসমেটের সঙ্গে প্রেম করে সফল হয়েছে এমন প্রেমিক জুটি শতকরা পাচ ভাগ।

ছয়. স্কুল, কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে প্রেম হয়েছে এমন ছাত্রী শতকরা চল্লিশ ভাগ এবং ছাত্র শতকরা পয়ষট্টি ভাগ।

সাত. এতোটুকু জীবনে একাধিক প্রেম করেছে এমন প্রেমিক শতকরা পচাশি ভাগ আর প্রেমিকা শতকরা আটষট্টি ভাগ।

আট. অতীত জীবনে একাধিক প্রেমের অফার পেয়েছে এমন মেয়ে শতকরা আটানব্বই ভাগ এবং ছেলে শতকরা পচিশ ভাগ।

নয়. মাস্টার্সে পড়ে অথচ কখনো প্রেম করেনি এমন ছাত্র শতকরা বিশ ভাগ এবং ছাত্রী শতকরা আট ভাগ।

দশ. ব্যর্থ প্রেমিকা (সর্বোচ্চ মাস্টার্স পর্যন্ত) শতকরা বিশ ভাগ এবং ব্যর্থ প্রেমিক শতকরা পয়তাল্লিশ ভাগ।

এগারো. প্রেমিকাকে চুমু খেয়েছে এমন প্রেমিক শতকরা পচানব্বই ভাগ, প্রেমিকার বক্ষদেশ স্পর্শ করেছে শতকরা নব্বই ভাগ এবং প্রেমিকার সঙ্গে সেক্স করেছে শতকরা চল্লিশ ভাগ।

বারো. শুধুমাত্র ছাত্রদের মধ্যে জীবনে একবার হলেও পতিতালয়ে গমন করেছে এমন সংখ্যা শতকরা চল্লিশ এবং নিয়মিত যায় শতকরা দশ ভাগ।

তেরো. ছাত্রীদের মাঝে এমন সংখ্যা জরিপ সম্ভব হয়নি।

চৌদ্দ. কমপক্ষে একবার পর্নো ছবি দেখেছে ছাত্র শতকরা সাতানব্বই ভাগ এবং ছাত্রী শতকরা পয়ষট্টি ভাগ।

পনেরো. ছাত্রদের মাঝে ধূমপায়ী ২০%।

ষোল. প্রেমিক ছাড়া অন্য পুরুষ দিয়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে এমন ছাত্রী সংখ্যা শতকরা পচাশি ভাগ।

সতেরো. এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতন : ছাত্র শতকরা ছিয়াশি ভাগ, ছাত্রী শতকরা নব্বই ভাগ।

আঠারো. ক্যাম্পাসে বোরখা পরা ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ত্রিশ ভাগ। বোরখাওয়ালা ছাত্রীদের মাঝে প্রেম করে এমন সংখ্যা শতকরা নব্বই ভাগ।

উনিশ. ক্যাম্পাসে দাড়ি-টুপিওয়ালা ছাত্র সংখ্যা শতকরা তিন ভাগ।

বিশ. প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝে যায়যায়দিনের অন্তত ভালোবাসা সংখ্যাটা পড়ে এমন সংখ্যা শতকরা নব্বই ভাগ।

আপনারা হয়তো উপরের তথ্যগুলো পড়ে স্পষ্ট বুঝতে পারেননি। আসলে এগুলো আমাদের অনেক দিনের অনেক পরিশ্রমের ফসল। আমরা পাচ বন্ধু, প্রত্যেকের নামের প্রথম অক্ষর যথাক্রমে এ, পি, এস, এম, এস, একই বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। কুমিল্লার একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্টুডেন্ট আমরা। আমরা পাচ বন্ধুর সঙ্গে আরো পাচ বিভাগ থেকে মোট পনেরো জনসহ বিশ জনের প্রত্যেকেই পরস্পর বন্ধুসুলভ।

বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মাঝ থেকে জরিপ কার্যটি সম্পন্ন করতে আমাদের দুই মাসেরও অধিক সময় লেগেছে। অনেক আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন কৌশলে তথ্য আদায়ে অনেক শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিন্ন পদক্ষেপে কাজ হয়েছে। অর্থাৎ বিষয় ভিত্তিক আলাদা জরিপ হয়েছে। ছাত্রীর বিষয়গুলো ছাত্রীদের মাঝেই, ছাত্রেরটা ছাত্রদের মাঝে। প্রেমের বিষয়গুলো প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। কোনো বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ এক হাজার জনের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

ভালোবাসা দিবস ২০০৬ উপলক্ষে দেশের সব প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য আমাদের জরিপের উপাত্তগুলো উৎসর্গ করছি।

কুমিল্লা থেকে

নিল এন নিক্কি

প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়ে যাই। মূলত তার হাসি এবং চশমা আমাকে উন্মাদ বানিয়ে দেয়। তাই তাকে কারিনা বলেই ডাকতাম। এক বন্ধুর মাধ্যমে আমি তাকে মনের কথা জানাই এবং সে তাতে সায় দেয়।

এভাবেই শুরু হয় আমাদের প্রেম। তাকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানোসহ প্রাইভেট ফাকি দিয়ে প্রেম করা ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। এবং এ কারণেই বুয়েটে ভর্তি হতে পারিনি। আমি ছিলাম কিছুটা বা অনেকটাই কামুক প্রকৃতির। মাঝে মধ্যেই আমি তার সঙ্গে সেক্স বিষয়ে আলোচনা করতাম।

এরই মধ্যে একদিন রাজি করিয়ে এক বন্ধুর বাসায় তার সঙ্গে সেক্স করি। এরপরই সে বদলাতে থাকে এবং একদিন সে বলে আমি তার দেহকে ভালোবেসেছি, মনকে নয়। তাই সে আমাকে আর ভালোবাসবে না। এভাবেই ইতি ঘটে আমার প্রেমের। কিন্তু কখনোই আমি তার দেহ বা মনকে আলাদা করে ভালোবাসিনি।

এর প্রায় দুই বছর পর একটি হিন্দি ছবি দেখি যার নাম *নিল এন নিক্কি*। তাতে দেখা যায় উদয় চোপরার কামুক স্বভাব বুঝতে পেরে নায়িকা তানিশা চলে যায় এবং পরবর্তীকালে আবার তার কাছে ফিরে আসে। তাই আজও আশায় বুক বেধে বসে আছি আমার কারিনা আমার কাছে ফিরে আসে কি না!

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ধৈর্য

–শিউলি জামান

আমি গ্রামের সহজ সরল মেয়ে, তেমন লেখাপড়া জানি না। এসএসসি পাস করেছি মাত্র। আমার বিয়ে হয় ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তাও সরকারি রেজিস্টার্ড। কিন্তু একত্রে থাকার অধিকার নেই। গ্রামে প্রচলন আছে ছেলেকে বন্দী করার পদ্ধতি কবুল না বলা পর্যন্ত একসঙ্গে থাকা যাবে না ধর্মীয় নীতিতে।

সে আমার প্রতিবেশী। আমি থাকি খুলনাতে। কাজের কারণে স্বামী থাকেন ঢাকাতে। মাঝে মধ্যে ঢাকা থেকে আসার পর যে কয়েকদিন থাকতো, বেশির ভাগ আমার কাছে থাকতো। একটি রুমে সকাল নয়টায় ঢুকতাম রাত এগারোটায় চলে যেতো। এর মধ্যে দুপুর–রাতে খেতাম মাত্র। প্রেমিক স্বামী আমাকে একান্তে পাওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করতো। বিভিন্ন কারণে ধৈর্য ধরে থাকতাম।

তবে আমার বুকের উচু অংশে হাত বুলিয়ে অনেক আনন্দ পেতো বুঝতাম। ওকে কিছু বলতাম না। এমনও হয়েছে আমাকে বোঝানোর জন্য পকেটে কনডম পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

বলতাম, ধৈর্য থাকা ভালো। তোমার পরিকল্পনা করো। বাড়িটা শেষ করো বলে কাটিয়ে দিতাম।

সে তখন ছোট ছেলের মতো আচরণ করতো। আমার মনে হয় ছেলেরা প্রেমে পড়লে এ রকম হয়। আমার ধৈর্যের কারণে ওর ভালোবাসার পরিমাণ আরো বেড়েছে। তিনশ–র উপরে চিঠি লিখেছে। চিঠির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ষোল। এই মধুর প্রেমের কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

আমার ধৈর্যের ফসল ফলেছিল ২০০২ সালে। তাকে একান্তে পেলাম। সেই আনন্দে কেদেছিলাম দুজনে অনেক। একে অপরকে জড়িয়ে ছিলাম কয়েক ঘণ্টা।

কিছুক্ষণ পর স্বামীধন আরো কিছু পেতে ক্ষিপ্র হয়ে উঠলো। বুঝতে পেরে তাকে বললাম, আমার জীবন, তোমাকে আরো ধৈর্য ধরতে হবে কিছুদিন। কারণ আমার Red Day চলছে।

এরপর দেখেছি সিংহের মতো শক্তি সম্পন্ন যৌন তৃপ্তির চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার হরেক রকম কৌশলে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা কামসূত্রের সমস্ত সূত্র প্রয়োগ করা। আমার জমিতে চাষ করেছে। গাছে ফসল ধরেছে। সেই ফসলকে নিয়ে মহা সুখে আছি। ওর বুকে মাথা রেখে যেন মরতে পারি।

পরিশেষে মেয়েদের বলবো, তোমরা ধৈর্যশীল হও। প্রেম করার সময় বিছানায় যাবে না। বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

সেনহাটী, খুলনা থেকে

দুই পণ্ডিত

–পলি হক

প্রবাস জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ আমার *দুই পণ্ডিত*।

প্রথম যখন সুইডেন আসি প্রতীকের বয়স তখন ছয় আর সান্ত্বনার চার। দুজনকে নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণ এক অনাবিল আনন্দে ভরে থাকতো।

ছুটির দিনগুলোতে তাদের নাশতার তালিকায় ছিল *আটার রুটি* যেটা না হলে সুন্দর সকালটা কুরুক্ষেত্রে পরিণত হতো। এ কুরুক্ষেত্র এড়াতে ছুটির সকালে আমার আরামের বিছানা ছেড়ে পিড়ি বেলুনের মিলন ঘটাতে হতো, যার মাঝে বাধা হয়ে থাকতো গোল আটার রুটি। গরম রুটিতে ঘি ও চিনি মিশিয়ে পেচিয়ে

তাতে কামড় বসিয়েই দুই পণ্ডিতের শান্তি। চেয়ারে পা ঝুলিয়ে রুটি খেতে খেতে চলতো আমাদের ছড়া কাটার খেলা। রুটির খামির বানানোর বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল সান্ত্বনা। ছোট দুটি হাত দিয়ে খুব চমৎকার করে আটা ছানতো আর প্রতীকের কাজ ছিল রুটিতে ঘি-চিনি মিশিয়ে রোলস বানানো।

এমনি এক সকালে নাশতা শেষে প্রতীক বললো, *মামনি চলো আজ দুপুরে আমি তোমাদের ম্যাকডোনাল্ডসে খাওয়াবো। পত্রিকা থেকে কাটা আমার কাছে দুটো কুপন আছে। তাতে পয়সা কম লাগবে।*

বেশ তাই হবে। বললাম।

আমরা ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে কোণায় একটি টেবিল দখল করলাম।

প্রতীকের দিকে তাকাতেই বলে উঠলো, মামনি, আমি জানি পয়সাটা তুমি দেবে।

কি আর করা? পণ্ডিতের তো আর মায়ের পকেটের করুণ অবস্থার কথা জানা নেই।

আচ্ছা আমিই দেবো, তবে তুমি আমাকে একশ ক্রোনার ধার দেবে।

প্রতীকের উত্তর, ঠিক আছে। দেবো।

কিন্তু তুমি আমাকে একশ ক্রোনারের বদলে একশ বিশ ক্রোনার ফেরত দেবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করলাম, কারণ?

প্রতীক হেসে বললো কারণ আমার টাকার একটা বাবু হবে।

সান্ত্বনা এতোক্ষণ চুপচাপ বসে শুনছিল হঠাৎ বলে উঠলো তোমার টাকা যদি জন্ম দেয়, তাহলে ওটা মরতেও পারে। মামনি ভাইয়াকে তাহলে জিরো ক্রোনার দেবে।

প্রতীক অগ্নিশর্মা হয়ে বললো, না আমার টাকা কখনো মরে না।

সান্ত্বনা অটল। সে বললো, এটা অন্যায় জন্ম দিলে মরবেও। এতো পানির মতো সহজ কথা।

সান্ত্বনা তুমি কি জানো, আমি এখন একজন আবিষ্কারক। বড় হলে আলফ্রেড নোবেলের মতো একজন বড় বৈজ্ঞানিক হবো। একথাও জানি আমার টাকা শুধু জন্মই দেয় কখনো মরে না। টাকা যদি মরে যায় তাহলে কি করে ডোনাল্ড ডাক-এর মতো মজার মজার বই কিনবো?

চুপচাপ বসে দুই পণ্ডিতের কথা শুনছিলাম। শেষ পর্যন্ত তাদের যুক্তির কাছে হার মেনে পণ্ডিতকে দিতে হলো একশ বিশ ক্রোনার এবং ছোট পণ্ডিতকে বিশ ক্রোনার। কারণ ছোট পণ্ডিত সান্ত্বনার যুক্তি :

যদি তোমার টাকা বিশ ক্রোনারের জন্ম দেয় তাহলে আমিও বিশ ক্রোনার পাবো। আমি তোমার বোন এবং জানি তোমার টাকা আমার জন্য যমজ টাকার জন্ম দেবে।

স্কারহোল মেইন, সুইডেন থেকে

প্রতীক্ষা

–হাছিনা তারিক

আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় আট বছর হলো। এই আট বছরে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে আমাকে আমার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকতে হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম আমার স্বামী আমাকে রেখে দেশের বাইরে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নির্বাচিত হয়ে সে যাচ্ছে লাইবেরিয়া। একজন সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী হিসাবে ব্যাপারটা সহজেই মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু এই সাময়িক বিচ্ছেদ আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। আমাকে নিঃস্ব, রিক্ত, শূন্য করে তারিক (আমার স্বামী) এক বছরের জন্য লাইবেরিয়া যাচ্ছে।

এ বছর ভালোবাসা দিবসে তারিক আমার কাছে থাকবে না, আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে ঠোটে ঠোট রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলবে না *হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে*। এটা ভাবতেই আমার দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। কষ্টে বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের দুবছরের ছেলে কাব্য যখন বলে, মাম বাবা কোথায়? তখন আমার কষ্টটা যেন বহুগুণ বেড়ে যায়।

গত বছর ভালোবাসা দিবসে কি কাণ্ডটাই না করলো তারিক। সকালে যথানিয়মে ঘুম থেকে উঠে আমাকে কিছু না বলে অফিসে চলে গেল। আমি তো অবাক বিস্ময়ে কিছুটা অভিমান করে বাসায় বসে আছি। ঘণ্টাখানেক পরে ডোরবেল বেজে উঠলো, দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললাম। দেখি বিশাল এক ফুলের তোড়া হাতে তারিকের রানার দাড়িয়ে আছে।

ম্যাডাম, আপনার জন্য স্যার পাঠিয়েছেন।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। সে এভাবে চমকে দেবে আমি ভাবতে পারিনি।

আমার এক প্রতিবেশীকে চিনি যার স্বামী বহু বছর ধরে বিদেশে থাকেন। ভদ্রমহিলা একমাত্র সন্তান নিয়ে দেশেই থাকেন। তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলে মলিন মুখে বলেন, এই তো আগামী মাসে আসবেন। বেচারীর আগামী মাস যেন আর শেষ হয় না। আমার ভাবতে অবাক লাগে, তারা কেমন করে দুজন দুজনকে ছেড়ে থাকেন। এ কেমন বেচে থাকা?

আমি এক বছর তারিককে ছেড়ে কেমন করে থাকবো? পারবো না। আমি পারবো না তাকে ছেড়ে থাকতে। একটি দিন মনে হবে একটি বছর। আমি প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণ কেবল তারই ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকবো।

বরিশাল থেকে